উম্মাতুন ওয়াহিদাহ

আমরা এক উম্মাহ

ইস্যু - ০২ | যিলহজ্ব- ১৪৪০ হিজরি

জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের অফিসিয়াল ম্যাগাজিন
উম্মাতুন ওয়াহিদাহ- ইস্যু-০২ এর নির্বাচিত প্রবন্ধ অনুবাদ

উম্মাতুন ওয়াহিদাহ অনুবাদ পরিবার

সম্পাদকঃ আবু যুবাইদা

সহকারী সম্পাদকঃ খালিদ আব্দুর রহমান

অনুবাদক

সাইফুল ইসলাম

জামিল মাহমুদ

মুহাম্মাদ সালমান

আবু দুজানা

সালাহুদ্দীন

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আব্দুল কুদ্দুস

প্রকাশের তারিখ

শাবান, ১৪৪২ হিজরি

এপ্রিল, ২০২১ ইংরেজি

AL HIKMAH MEDIA

সূচী

০৪. আমেরিকা জ্বলছে!

০৭. ‘করোনা মহামারী: বৃদ্ধদের চিকিৎসার ব্যাপারে ইসলামিক শরীয়াহ এবং পশ্চিমা দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য’

১০. সংস্কৃতি: গুপ্তচরবৃত্তির শক্তিশালী মাধ্যম

১৯. ‘বিপ্লবের কেন্দ্র থেকে কয়েক পলক দৃষ্টিপাত’

২২. ধ্বংসের মুখে আমেরিকান অর্থনীতি (দ্বিতীয় পর্ব)

২৮. কার্টুন: বর্তমান যুগের এক মারাত্মক ব্যাধি

৩৫. “রাজনীতি এবং চরিত্র গঠনে ইউসুফ (আ.) মুজাহিদদের জন্য অনুকরণীয়”

৪০. এক শহীদের তরে

৪৮. বিশুদ্ধ রক্তস্নাত আফগান (শেষপর্ব)

৫২. দ্বিতীয় আসর: ইমাম আযযাম ও বিন লাদেন ইমামদ্বয়ের হত্যা ও তাকফীরের মাসআলাসমূহ

৬৭. ‘মুসলিম বিশ্বের খবরাখবর’

৭০. অনন্য কবিতা

আমেরিকা জ্বলছে!

উম্মাতুন ওয়াহিদাহ | ০৪

করোনা, অভ্যন্তরীণ বিভাজন, বর্ণবাদ, নাজুক অর্থনীতি ও মুজাহিদদের আক্রমণ; এগুলো হলো আমেরিকার পেন্টাগনের কফিনের পাঁচটি পেরেক। সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমেরিকার অবয়ব ধ্বংস করাতে একের পর এক নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছেন। এক অদৃশ্য, অদেখা সৈনিক কোভিড-১৯, আমেরিকার পচা দেহ ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে। আমেরিকার অবস্থা এখন এমন এক রোগীর মতো যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই দুর্বল। রোগের সব উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

বেলুনের মত ফুলে উঠা আমেরিকার সুদভিত্তিক অর্থনীতি ফেটে যাবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। আর এটা শুধু আমেরিকার জন্যই হুমকি নয় বরং এটা গোটা পশ্চিমা বিশ্বের জন্যও হুমকি। আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়েছে। রেশনের লাইনগুলোর দৈর্ঘ্য মাইল ছাড়িয়েছে। আসন্ন অর্থনৈতিক ধ্বস থামানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসেবে আমেরিকা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ব্যাংক নোট ছাপাচ্ছে। ন্যান্সি পেলোসি ৩ ট্রিলিয়ন ডলার ছাপানোর প্রস্তাব দিয়েছে। পতন ঠেকানোর জন্য রিপাবলিকান দলের নেতা মিচ ম্যাককনেল আমেরিকার অর্থনীতিতে ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার ইঞ্জেক্ট করার কথা বলেছে। এটা তো কেবল শুরু। আত্মহত্যার হার, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিভাজন সমাজের সকল পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রাম্প ও পেলোসি সারাক্ষণ তাদের প্রিয় শখ, গালাগালিতে ব্যস্ত। পেলোসি, ট্রাম্পকে মোটা বৃদ্ধ লোক বলে উপহাস করে আর ট্রাম্প তাকে মানসিক বিকারগ্রস্ত মহিলা হিসেবে বর্ণনা করে। ন্যান্সি, প্রতি উত্তরে এমন সব জবাব দেয় যা এখানে উল্লেখ করার মতো নয়। আমেরিকা জুড়ে সশস্ত্র বিক্ষোভ হচ্ছে। গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছে। সর্বশেষ গৃহযুদ্ধ আমেরিকার জন্মের সূচনা করেছিল; আর এই গৃহযুদ্ধে ইনশাআল্লাহ এর পতন হবে।

আর এই যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলো ঘটেছে একজন গরীব অ্যাফ্রো আমেরিকানের মাধ্যমে। চারজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ, জর্জ ফ্লয়েড নামের এই কৃষ্ণাঙ্গ লোককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল। ফ্লয়েড মৃত্যুর আগে "আমি শ্বাস নিতে পারছি না" বলে অনেকবার বাঁচার আকুতি জানিয়েছিল। কিন্তু বর্ণবাদী দাম্ভিকতা দিয়ে তা উপেক্ষা করে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। সম্ভবত এই গরীব লোকটি - নিকট অতীতে তার পূর্বপুরুষদের সাথে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা কী করেছিল তা ভুলে গিয়েছিল। মার্কিন সমাজের বৃহদাংশ জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, মিশরীয়রা যেমন খালিদ সায়িদের হত্যার প্রতিবাদ করেছিল।

এরকম নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আমেরিকার জনগণ রাস্তায় নেমে এসেছিল। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, চরমপন্থী, বর্ণবাদী, বামপন্থী, হত দরিদ্র - সকলেই এসেছিল তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য। জ্বালাও-পোড়াও, লুটপাট, হাইওয়ে অবরোধ, কারফিউ, আমেরিকার রাস্তাগুলোর নিত্য নৈমিত্তিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ট্রাম্প তার নিজের জনগণকে হুমকি দিয়েছিল যে, যদি তারা বিক্ষোভ বন্ধ না করে তাহলে এটা দমন করার জন্য সে হিংস্র কুকুর ও প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করবে।

গাদ্দাফী তার বিখ্যাত 'জাংকা জাংকা' হুমকির মাধ্যমে তার নিজের দেশের জনগণকে যেমন শাসিয়েছিল, ট্রাম্পও অনেকটা তাই করেছিল।

মুজাহিদরা, উম্মাহকে আমেরিকার অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য, আমেরিকার উপর একের পর এক আক্রমণ চালিয়েই যাচ্ছেন। তাঁরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও উম্মাহর সমর্থনে - ক্রমাগত আমেরিকাকে আক্রমণ করছেন। তাঁদের সর্বশেষ আক্রমণটি ছিল শহীদ শিমরানীর রেইড। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুক। এই উম্মাহর বীরেরা কি দুইটি ওয়াদা - বিজয় কিংবা শাহাদাত - পূর্ণ হওয়া অবধি তাঁদের এই মহান অভিযানে ছুটে চলবে না?

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। [সূরা আত-তাওবা,৯: ৫২]

আমেরিকার অত্যাচার বা যে কোনো অত্যাচার সম্বন্ধে, আমরা আল-কায়েদার 'জিহাদের সাধারণ দিক-নির্দেশনা' রচনার পনেরো নাম্বার পয়েন্টটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর তা হলো, "যেকোনো অত্যাচারিত ও পরাধীন মানুষ যেখানেই অত্যাচারের শিকার হোক না কেনো, তারা হোক মুসলিম কিংবা অমুসলিম; আমরা তাদের সাহায্য করি"।
হে অ্যাফ্রো আমেরিকান সম্প্রদায়,

গণতন্ত্রবাদীদের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। তারা রিপাবলিকানদের থেকে ভিন্ন নয়। তাদের মুখ ফসকে একটা কথা বের হলেই আপনার ব্যাপারে তাদের মনোভাব কেমন আপনি তা বুঝতে পারবেন। তারা আপনাকে হোয়াইট হাউজের দাস ছাড়া কিছুই মনে করে না, যা শহীদ ম্যালকম এক্স যথার্থভাবে খুঁজে বের করেছিলেন। এটা খুব আগের কথা নয়, যখন বাইডেন একজন আমেরিকান সাংবাদিককে বলেছিল, 'সে কৃষ্ণাঙ্গ হলে ট্রাম্পকে ভোট দিত না'। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা জানে যে, সকল ডেমোক্রেটরা কেবল তাদের ধনসম্পদ, ভোটব্যাংক, প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি আগ্রহী।

বাইডেন ও ওবামা, আট বছরেরও বেশি ক্ষমতায় ছিল। তারা যা কিছু করেছিল তা হলো আপনাদের উপর বছরের পর বছর ধরে চলে আসা অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্রতা ও বর্ণবাদ যেন সামনের বছরগুলোতে চলে সেটা নিশ্চিত করা। তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়ে তাদের ব্যাংক একাউন্ট পূর্ণ করেছে। ওবামা যখন হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেছিল তখন তার ব্যাংক একাউন্টে মিলিয়ন ডলারও ছিল না। হোয়াইট হাউস থেকে যখন বের হলো তখন তার ব্যাংক একাউন্টে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার জমা। সেই সাথে প্রাসাদের মতো বাড়ি, অনেক জমি জমা।

ক্লিনটন, আট বছর হোয়াইট হাউসে কাটিয়েছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তার ব্যাংক একাউন্টে সরিয়েছে, আপনাদের দুঃখ কষ্টের সময়ও। ন্যান্সি পেলোসি কয়েক দশক ধরে কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে আছে। সেও আপনাদের জন্য সামান্যই উদ্বিগ্ন। তার ভাবখানা এমন, তার ফ্রিজ দামি দামি খাবারে ভরা থাকবে ঐ সময়েও যখন আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গরা ক্ষুধা নিবারণের জন্য সামান্য খাবারটুকুও পায় না। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনাদের একমাত্র উপায় হলো, শহীদ ম্যালকম এক্স-এর উপদেশ অনুসরণ করা। ইসলামকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে এবং তার মূল্যবান উক্তি আত্মস্থ করার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, "স্বাধীনতার মূল্য হলো প্রকৃত মৃত্যু"। যদি আপনাদের পূর্বপুরুষরা গুরুত্বের সাথে এই উপদেশগুলো গ্রহণ করত, তাহলে আজকে আপনারা স্বাধীন থাকতেন। সুতরাং, স্বাধীনতার উপর দাসত্বকে গ্রহণ করে আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি অবিচার করবেন না।

করোনা মহামারী

‘বৃদ্ধদের চিকিৎসার ব্যাপারে ইসলামিক শরীয়াহ এবং পশ্চিমা দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য’

সালমান আন-নজদি

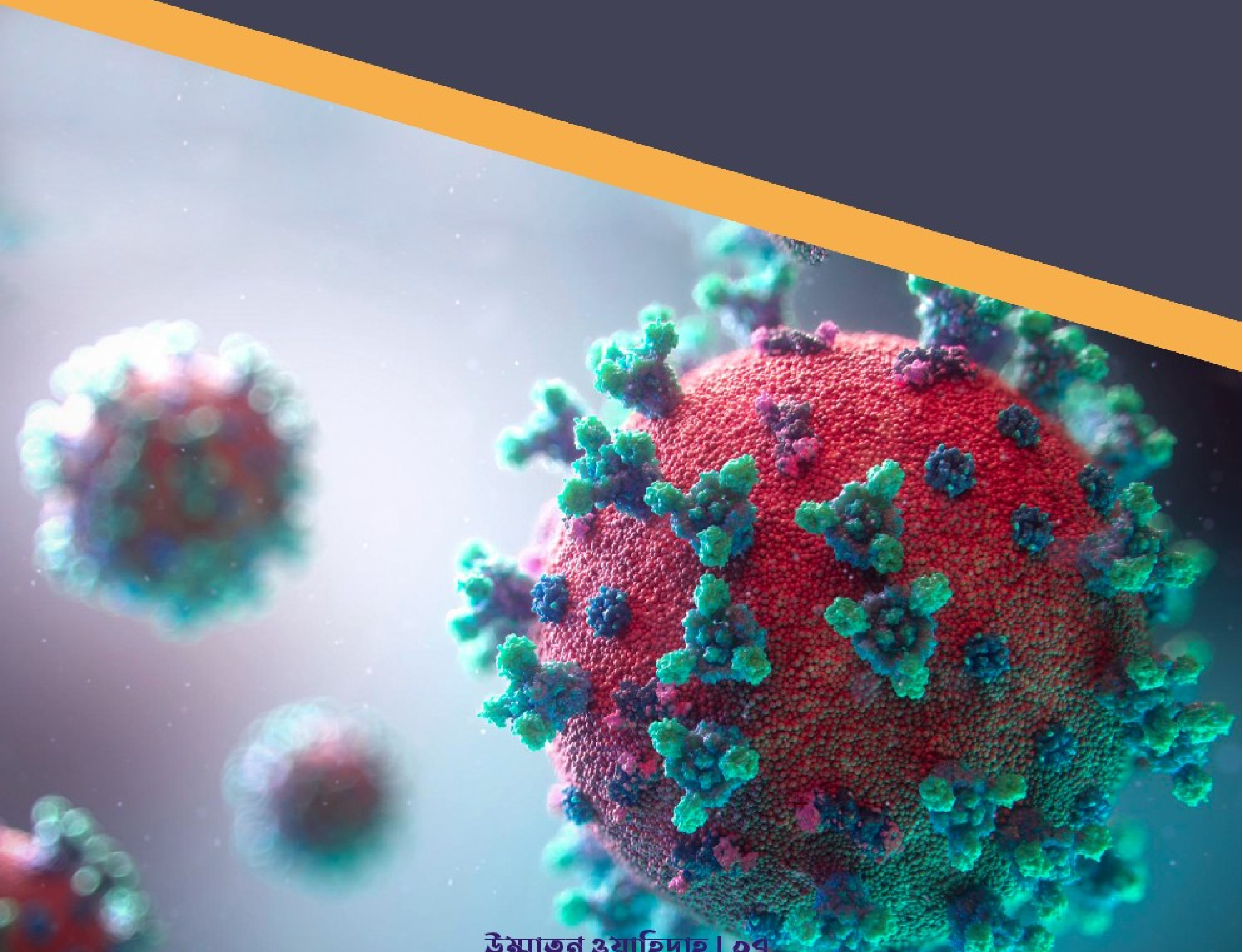

আল্লাহর অতিক্ষুদ্র সৈনিক কোভিড-১৯ এর মাধ্যমে অনেকগুলো তিক্ত সত্য প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বের মূল্যবোধ এবং সামাজিক রীতিনীতিগুলোর বিপরীতে পশ্চিমা সমাজের মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা, করোনায় আক্রান্ত প্রবীণদের চিকিৎসার দুরাবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে আমরা মহামারী, সংক্রামক রোগের সময়ে মৃত্যু এবং বয়স্কদের চিকিৎসা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামী এবং পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে পার্থক্যগুলো সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করতে চাই।

মুসলিমরা করোনার মতো মহামারীকে আল্লাহর একটি পরীক্ষা এবং তাদের পাপের শাস্তি হিসাবে বিবেচনা করেন। তারা এই ধরনের পরীক্ষাকে তাওবা করে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যম হিসেবে দেখেন। মনে এই আশা রাখেন যে, তিনি এই দুর্যোগটি প্রত্যাহার করবেন। মুসলিমরা মহামারীকে তাদের তাকদীরের অংশ বলে মনে করেন। তারা মনে করেন এধরণের মহামারীতে যারা মারা যান তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন - যেমনটা আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন।
বয়স্ক এবং গরীবদের সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। তাদের জন্য, বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য সুচিকিৎসা, সম্মান প্রদর্শন, সেবা-যত্ন নিশ্চিত করা ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। যৌবনে সমাজের উন্নতির জন্য এবং মুমিন নারী পুরুষের একটি প্রজন্মের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য যে ভূমিকা তাঁরা রেখেছিলেন তার এক ধরণের স্বীকৃতি - এই সম্মান প্রদর্শন বা সেবা যত্নের বিষয়টি।

মুসলিম সমাজ সম্মিলিতভাবে, যারা অতীতে সমাজের উন্নতিকল্পে অবদান রেখেছিলেন তাঁদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব, উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। ইসলামী শরীয়তের মূলনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল - বড়দের শ্রদ্ধা করা, দুর্বল এবং গরীবদের সাথে সদয় আচরণ করা।

আবু মুসা আল আশ'আরি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"সাদা দাড়িওয়ালা মুসলিমকে সম্মান করা আল্লাহর প্রশংসা করার অংশ"

অবিশ্বাসী পাশ্চাত্যের কুরআনের নৈতিকতার সাথে পরিচয় নেই। ওহীর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সমাজে বেড়ে ওঠার সুযোগও তারা পায় না। বয়স্কদের সম্মান-শ্রদ্ধার বিষয় সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। বয়স্কদের তারা বোঝা মনে করে। সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য বয়স্করা বোঝাস্বরূপ তা পাশ্চাত্যের অনেকেই প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়!
তারা মনে করে বৃদ্ধ বাবা-মা বা সমাজের প্রবীন ব্যক্তিরা যেহেতু আর উৎপাদনশীল কর্মযজ্ঞে অংশ নিতে পারছে না তাই তাদের উচিত স্বেচ্ছায় 'আরামদায়ক মৃত্যুর' সুযোগ গ্রহণ করে রাষ্ট্রকে বোঝা বহনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা দর্শন মানুষকে একটা উৎপাদনশীল যন্ত্র হিসেবে দেখে। যতক্ষণ সে সমাজকে সার্ভিস দিতে পারছে ততক্ষণ সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু যখন তার এই কর্মক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, তখন সমাজের বোঝা হয়ে থাকার চেয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে নেওয়াকে উৎসাহিত করে।

করোনা, পশ্চিমা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ যুদ্ধে করোনা কিছুই হারায়নি বরং দিন দিন তার অর্জনের পাল্লা ভারী হচ্ছে। প্রতি দিনই পশ্চিমাদের সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরও বেশি সাফল্য আসছে। পুরো বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে, মানবাধিকারের জয়গান গাওয়া পশ্চিমা সমাজ কীভাবে তাদের বয়স্ক নাগরিকদের অধিকার পদদলিত করছে! বিশ্ব দেখছে কীভাবে পাশ্চাত্য, তাদের বয়স্ক নাগরিকদের আগলে রাখার পরিবর্তে অসহায় মানুষগুলোকে করোনার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। স্পেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছে, জীবাণুমুক্তকরণ অভিযানের সময় বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে তারা ডজন ডজন মৃতদেহ আবিষ্কার করছে।

করোনা সংক্রমণের ভয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং নার্সিং কর্মীরা এই বৃদ্ধদের পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। একই ধরণের ঘটনা ঘটেছে আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানি এবং ইউরোপের বাকি অংশে। পরিসংখ্যান অনুসারে, বৃটেনে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন বয়স্ক ব্যক্তি বৃদ্ধাশ্রমে মারা যাচ্ছে। নিউ জার্সিতে, একটি বিশাল বৃদ্ধাশ্রমে পুলিশ কয়েক ডজন মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। ফ্রান্সে চিকিৎসকরা কোনো ধরণের পূর্ব সংকেত ছাড়াই দায়িত্ব ত্যাগ করে পালিয়েছে। বৃদ্ধদের ফেলে রেখে গিয়েছে অনাহারে কিংবা করোনা ভাইরাসের হাতে মৃত্যুবরণ করার জন্য।

যে সত্যটি অবশ্যই সামনে আনতে হবে তা হল, সমসাময়িক পশ্চিমা দর্শন করোনা ভাইরাসকে তাদের সমাজের জন্য একটা 'চূড়ান্ত সমাধান' মনে করে। তারা মনে করে এর মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির বোঝা বৃদ্ধরা মরে সাফ হয়ে তাদের মুক্তি দিবে বোঝা বহনের হাত থেকে।

পশ্চিমা বস্তুবাদের চূড়ান্ত বর্বর আচরণের সাক্ষী হচ্ছি আমরা। আমরা এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থায় রয়েছি যা কোভিড -১৯ কে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ময়দান সমতল করার একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে। এ কারণেই বৃদ্ধাশ্রমগুলো বয়স্কদের জন্য মর্গে পরিণত হয়েছে। প্রবীণ প্রজন্ম, নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনেকেই খোলাখুলিভাবে পাশ্চাত্যে বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসার প্রচন্ড অভাবের বিষয়ে মুখ খুলেছেন। প্রবীণ প্রজন্ম অনুভব করতে পারছে পাশ্চাত্য সমাজে তারা অনাহূত, এই সমাজ আর তাদের চায় না। পাশ্চাত্য সমাজ তাদের থেকে মুক্তি চায়। ইসলামের নিয়ামাত পেয়ে আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের পথ প্রদর্শন করেছেন- একারণে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা কখনই হেদায়াত পেতাম না, যদি তিনি আমাদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত না করতেন। নিশ্চয়ই আমাদের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।

পরিশেষে আমরা মুসলিমদের মনে করিয়ে দিতে চাই - তাদের বয়স্কদের যত্ন নেবার ব্যাপারে। কখনো যেন এমনটা না হয় যে, তাঁরা সেবা-যত্নের অভাব অনুভব করছেন। আমাদের এমনভাবে বয়স্কদের সেবা যত্ন করা উচিত যেন তাঁরা মনে করেন আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ, আমরা তাঁদের প্রতি ঋণী। নবী করীম ﷺ যেমন আদেশ করেছেন, তেমনি তাদের সেবা করে আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের পুরষ্কার অর্জন করা দরকার। আমাদের অবশ্যই তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে। আমাদের অবশ্যই মোহাব্বতের সাথে কথা বলতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের কাছে দিকনির্দেশনা চাইতে হবে। তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে হবে। যদি আমরা এটি করি, তাহলে তা আমাদের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহরই।

আবু মুসা আল আশ'আরি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সাদা দাড়িওয়ালা মুসলিমকে সম্মান করা আল্লাহর প্রশংসা করার অংশ"।

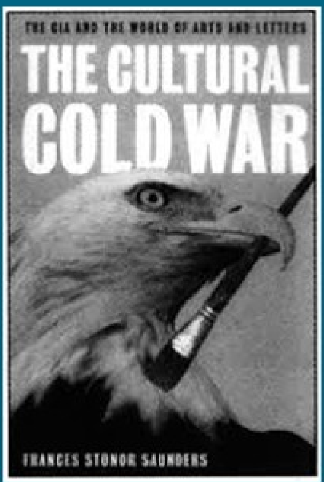

সংস্কৃতি: গুপ্তচরবৃত্তির শক্তিশালী মাধ্যম

আব্দুল আজিজ আল মাদানী

আমরা সবাই জানি, দুটো দলের মাঝে লড়াই কেবল সামরিক সরঞ্জামাদি ব্যবহারের মাধ্যমে হয় না। ইতিহাস সাক্ষী, যখন কোনো যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, তখন কেবল সামরিক ফ্রন্টটাই বন্ধ হয়। এর বাইরে অন্যান্য ফ্রন্ট ঠিকই চালু থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাদমান দুটি শক্তির উভয়টি অবশিষ্ট থাকে। আর অন্যান্য ফ্রন্ট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি, সামরিক ফ্রন্টের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে সম্পর্ক থাকে যে সমস্ত ফ্রন্টের। যেমন নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনীতি বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগ। এরপর এসমস্ত বিভাগের কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব বরাবরের মতোই বহাল থাকে। আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মূলতঃ এটাই। আর এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যম এবং প্রক্রিয়া বহুবিধ। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই প্রকাশ্য, কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপারগুলো অধিকাংশেরই দৃষ্টির আড়ালে। আর তেমনি একটা ফ্রন্ট হচ্ছে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট।

সংক্ষিপ্ত এ প্রবন্ধে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে, বিজাতীয় সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট এবং মুসলিম বিশ্বের উপর তার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্ক করা। এজন্য আমরা বিগত বছরগুলোতে এ বিষয়ের সবচেয়ে 'ভয়াবহ'-খ্যাত একটি গ্রন্থের পর্যালোচনা করবো। অনেক গবেষকই গ্রন্থটিকে এ বিশেষণেই উল্লেখ করেছেন। কারণ গ্রন্থটিতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে—মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তির কলাকৌশল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহারে তাদের বিভিন্ন পন্থা, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মার্কিন সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিবিধ উপায়, সাংস্কৃতিক এই যুদ্ধে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং 'সুশীল সমাজের' অংশগ্রহণের গোপন তথ্য, একদল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে তাদের অজ্ঞাতেই পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমর্থন দিয়ে আমেরিকার নিজের পক্ষে ব্যবহার, গোটা বিশ্বে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে মার্কিন ডলারের রহস্যময় ভূমিকা—এ জাতীয় বিষয়গুলো।

গ্রন্থটির নাম হচ্ছে— "দি কালচারাল কোল্ড ওয়ার"। গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছে সাংবাদিক এবং ইতিহাসবিদ 'ফ্রান্সেস স্টোনর স্যান্ডার্স'। অনুবাদ করেছেন ওস্তাদ ত্বল'আত শাএব। ইন্টারনেটে খুঁজলেই কিতাবটি পাওয়া যাবে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কোনোরকম ঐতিহাসিক গবেষণা, অথবা ইতিহাসের জ্ঞান সমৃদ্ধি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর না গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রতিটি বিষয়ের পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন অথবা সংস্কৃতির পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে লেখিকার সঙ্গে বিতর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে আমাদের মূল উদ্দিষ্ট বিষয় হলো, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুর মূলনীতি এবং কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যাতে যে সমস্ত বিষয় শত্রুর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করে, সাফল্যের পথে শত্রুকে অগ্রসর করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করে, সেসব বিষয় থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি।

বিগত বছরগুলোতে আমরা এদেশীয় কিছু লোকের কতক এমন ফতোয়া, গবেষণাপত্র এবং থিসিস দেখতে পেয়েছি, যেগুলো দ্বারা ইসলামের শত্রুরাই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছে। এসবের মধ্যে কিছু রয়েছে এমন ফতোয়া, যা মার্কিন বাহিনীতে চাকরি করাকে বৈধ বলে। কিছু ফতোয়ায় মুজাহিদদেরকে কারমাতিদের (একটি শিয়া সম্প্রদায়) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কতক ফতোয়ায় "ব্রেমের"কে মুসলিমদের শরীয়ত সম্মত শাসক ধরে নিয়ে তাঁর আনুগত্যের আবশ্যকতা আলোচনা করা হয়েছে।

একইভাবে আমরা ওই সময়টাতে কতক এমন ব্যক্তির বহুল প্রচারিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং রচনাবলী লক্ষ্য করেছি, যারা আমেরিকার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেছে। এদের মাঝে রয়েছে ফেতহুল্লাহ গুলেন, হাফতার প্রমুখের মতো ব্যক্তিবর্গ। প্রচার মাধ্যমগুলোতে, বিশেষ করে সৌদি এবং মিশরের পত্রিকাগুলোতে আরো এমন কিছু লোকের মুখবন্ধ এবং ভূমিকা ছাপা হয়েছে, যারা মানসিক বিকারগ্রস্ত। এসবের ফলে একটা সময় এমনকিছু চিন্তা এবং ধ্যানধারণা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে, যা দেখে হতবাক হয়ে নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করতে হয়, বর্তমান সময়ে এতটা ফলাও করে কী কারণে এ সমস্ত চিন্তা চেতনা প্রচার করা হচ্ছে? এতটা প্রচার-প্রচারণা কেন এসবের জন্য? সে সমস্ত ধ্যান ধারণার মধ্যে রয়েছে 'শরীয়তে ইসলামী, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নাম নয়', 'উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের নিয়ামক খেলাফত ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয়'—এর মত উদ্ভট ধারণা।

এরপর আরও রয়েছে ইসরাইলের কাছে মৈত্রীপত্র প্রেরণ, হলোকাস্ট উপলক্ষে তাদের প্রতি সমবেদনা, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শরীয়ত সম্মত কিনা—সে বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দানের মতো বিষয়গুলো। পরিতাপের বিষয় হলো, এইসমস্ত চিন্তা চেতনা এবং ধ্যান ধারণার কথা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ ইসলামী বিদ্যাপীঠ এবং শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। এসমস্ত গবেষণাপত্র এবং থিসিসের চাইতেও বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, সৌদি সরকার, আমিরাত সরকার, তুর্কি সরকার এবং কাতার সরকার এসমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। তারা এই সমস্ত গবেষণাপত্র এবং থিসিস প্রকাশ করে আমেরিকা ও ক্রুসেডার পশ্চিমাদের স্বার্থে এগুলো ব্যবহার করেছে।

এ সমস্ত সরকারই ইহুদিদের প্রতি তাদের হলোকাস্ট দিবসে সমাবেদনা ব্যক্ত করে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, হিরোশিমা এবং নাগাসাকির স্মৃতি স্মরণে কেনো তারা জাপানিদের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে না? ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের স্মরণে কেনো তারা ভিয়েতনামীদের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে না? নাকি ইহুদীদের সঙ্গে আপোষ এবং সমঝোতার বিষয়গুলো বর্তমান সময়ের ঘটনা? আর তাই আমেরিকা এবং ইহুদিদেরকে তাদেরই আমলা এবং এজেন্টদের সাহায্যে তারাই মুসলিম বিশ্বের উপর আগ্রাসন পরিচালনার অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, মুসলিম নামধারী এসমস্ত শাসকদের থেকে বাস্তবিকপক্ষে মুসলিমদের জন্য দুঃখ এবং শোক প্রকাশের বিষয়টি কখনোই আশা করা যায় না। পাঠক! আলোচ্য গ্রন্থখানা পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন, সাংস্কৃতিক আবহকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অনুসৃত একটি উপায় হচ্ছে, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগাযোগের লক্ষ্যে চ্যানেল তৈরি করা। তবে এ বিষয়ে আমেরিকার পূর্ণ সতর্কতা রয়েছে যে, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা যেন কোনোভাবেই এ সমস্ত চ্যানেলের পেছনে কারা কলকাঠি নাড়ছে সে বিষয়ে কিছুই জানতে না পারে। আমরা তো মনে করছি, সৌদি চ্যানেল, আমিরাত চ্যানেল এবং কাতার চ্যানেলের চাইতে অধিক বিশ্বস্ত আবার কোনো চ্যানেল হয় নাকি?

মার্কিনিদের আরেকটি কৌশল হলো, নিজেদের অজ্ঞাতে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমেরিকার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমর্থন দেয়া। এই ফাঁদে অধিকাংশ আলেম এবং দাঈ ব্যক্তিত্বরা পা দিয়েছেন। অবশেষে, যখন তাদেরকে ব্যবহারের মাধ্যমে আমেরিকার স্বার্থসিদ্ধি হয়ে যায়, যখন তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তখন সে আঞ্চলিক দোসর এবং আমলাদেরকে পরামর্শ দেয় সে সমস্ত আহলে এলেম এবং দাঈ ভাইদেরকে বন্দী করতে অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে।

এই এতটুকুতেই তো ঐ সমস্ত লোকের ব্যাপারে বুদ্ধিমান ব্যাক্তিদের সতর্কতা এবং সচেতনতা লাভ হয়ে যাওয়ার কথা, যারা এই সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা এবং অতি বিরল গবেষণাপত্রগুলোর প্রচারের ক্ষেত্রে নেপথ্যে থেকে কাজ করছে।

তেমনটাই ঘটেছে তোহা ইয়াসিন সাহেবের সঙ্গে। ফ্রান্স থেকে ফেরার পর জাহেলী যুগের কবিতা সম্পর্কে তার বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি এ কথাই প্রমাণ করে। তিনি দাবি করেন যে, এগুলো জাহেলী যুগে রচিত কবিতা নয়। মুসলিমরা কোরআন তাফসির করার জন্য নিজেরাই এগুলো রচনা করেছে! তার এমন বক্তব্যের অপনোদনে কলম ধরেছেন উস্তাদ আল্লামা মুজাহিদ মাহমুদ শাকের রহিমাহুল্লাহ। তিনি প্রমাণ করেছেন, "মুসলিমরা নিজেরাই জাহেলী যুগের কবিতার রচয়িতা"—এমন ধারণা সুচতুর প্রাচ্যবিদ ডেভিড স্যামুয়েল মার্গোলিওথ-এর, যা তোহা হোসাইন সাহেব চুরি করেছেন।

লক্ষ্য করুন! তোহা হোসাইন সাহেব কেমন করে মার্গোলিওথ-এর চিন্তা আমদানি করলেন! আর কেনোই বা তিনি ফ্রান্স থেকে ফেরার পর এই বিষয়টি উত্থাপন করলেন। অথচ ইতিপূর্বে ফ্রান্সে যাবার আগে তিনি জাহেলী কবিতা এবং জাহেলী যুগের কবিদের কথা স্বীকার করতেন! তোহা হোসাইন সাহেবের আসল অবস্থা সম্পর্কে উস্তাদ মুহাম্মদ হুসাইনের বক্তব্য পড়ে দেখুন, তিনি বলেন—

"আরব রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাংস্কৃতিক ফোরাম সম্পর্কে কথা হল; এর মূলে রয়েছেন তোহা হোসাইন সাহেব, যার গ্রন্থাদি সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি পাশ্চাত্যের একজন মুখপাত্র ছাড়া আর কিছুই নন। বাস্তবে যিনি পশ্চিমাদের একজন আমলা, যার দায়িত্ব হলো বিরাট একটি অঞ্চলে পশ্চিমা সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো..."

এসব কিছুই প্রমাণ করে, মুসলিম বিশ্বের উপর চলমান সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনা আসছে বাইরের শত্রুদের থেকে। আমাদের জানা নেই তোহা হোসাইন সাহেব ফ্রান্সে কাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন? মুসলিম বিশ্বে এমন ধারণা প্রচারের জন্য কারা তাকে দায়িত্ব দিয়েছে? এখন তোহা হোসাইন সাহেব জেনে বুঝেও এমন কাজ করে থাকতে পারেন কিংবা হতে পারে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি এমনটা করেছেন। ব্যাপারটি যাতে আরো স্পষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য দেখুন উস্তায আল্লামা মাহমুদ শাকের রাহিমাহুল্লাহ লুই আওয়াদের মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে কী লিখেছেন—

"পূর্ব থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল, তাছাড়া, আল্লাহ তায়ালার এটাই সিদ্ধান্ত ছিল যে, কোনো একদিন আমি লুই রচিত "বিশেষ কবিতা থেকে প্লুটোল্যান্ড এবং অন্যান্য কবিতা"-এর কিছু অংশ পড়ে দেখবো, যা তিনি "ক্রিস্টোফার স্কাইফ"-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এটা ১৯৪৭ (খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। এরপর একসময় আমি স্কাইফ সম্পর্কে গোপন কিছু তথ্য পেলাম যে, সে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অনুষদের অধ্যাপক এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ মন্ত্রণালয়ের পেশাদার একজন গুপ্তচর। তাছাড়া, ধূর্ত এই লোকটির রয়েছে ধর্মপ্রচারের মিশন এবং সাংস্কৃতিক এজেন্ডা। দুশ্চরিত্র, চক্রান্ত, দুরাচার তার মধ্যে বিদ্যমান। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রদের মাঝে পার্থক্য করে। তার ভক্ত অনুরাগী এবং মতের পক্ষের ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করে আর যারা একনিষ্ঠ ও দ্বীনদার, তাদের সাথে হঠকারিতা এবং বিদ্বেষমূলক আচরণ করে। কারণ এ ধরনের ছাত্রগুলোকে সে ব্রিটিশ নেতৃত্ব এবং খৃষ্টবাদ প্রচার মিশনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারেনা। তার চেয়ে বড় কথা যেটা আমার জানা ছিল, এই মিথ্যাবাদী দাজ্জাল কেবল অসার দাবিই উত্থাপন করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার কোনো যোগ্যতাই তার মাঝে নেই। কিন্তু তৎকালীন সময়ে যেহেতু ব্রিটিশদের প্রভাব বেশি ছিল, শাসন ক্ষমতা যেহেতু তাদের হাতেই ছিল, তাই আজাক্স আওয়াদ "প্লুটোল্যান্ড এবং অন্যান্য কবিতা" গ্রন্থখানা পেশাদার ওই গুপ্তচর, ধূর্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ধর্মপ্রচারকের কাছে পাঠানোর গোপন বিষয় আমার কাছে ফাঁস হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত এই মিথ্যাবাদী দাজ্জাল হচ্ছে 'ক্রিস্টোফার স্কাইফ'।"

আমরা পূর্বের গ্রন্থের আলোচনায় ফিরে যাই। এই গ্রন্থ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার মধ্যে যে স্নায়ু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার বিবরণ তুলে ধরেছে। সেখানে উঠে আসে, নিজ নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কেমন করে সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের ব্যবহার করা হয় এবং কিনে নেয়া হয়। আরো অনেক অন্ধকার দিগন্ত উন্মোচিত হয় গ্রন্থটিতে। এক্ষেত্রে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে গ্রন্থটি।

এমনকি ওই সময়টাতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো লেখিকার বর্ণনামতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তখন আমেরিকার সাংস্কৃতিক যুদ্ধ কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই ছিল না, বরং আরও বিভিন্ন সভ্যতার বিরুদ্ধে আমেরিকা এই সাংস্কৃতিক যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকে। ইসলামী বিশ্বও তার বাইরে ছিল না। তাই, আমেরিকা ইউসুফ আল খাল (লেবাননের একজন খ্রিষ্টান)-কে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে, যে "শে"র ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিল (১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)। বিষয়গুলো আমরা সকলেই জানি। আরেকজন হচ্ছে, তৌফিক সায়েগ, যে একজন ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান এবং 'হিওয়ার' ম্যাগাজিনের সম্পাদক(১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)। এদের মতো এরকম আরো অনেকেই রয়েছে। এসমস্ত বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে লেখিকা এমন কিছু সূত্র তুলে ধরেছে যেগুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়ে যায়। এছাড়াও লেখিকা সিআইএ-এর কতিপয় সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল, যারা সূত্রগুলোর বিশ্বস্থতা নিশ্চিত করেছে।

গ্রন্থের ১৭৭ নং পৃষ্ঠায় সিআইএ সদস্য ডোনাল্ড জেমসের একটি উক্তি রয়েছে, যেখানে তার চাকরির লক্ষ্য স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে: "এসমস্ত নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থার পরিকল্পনা ছিল নিজেদের রুটিনমাফিক সক্রিয়তা চলমান রাখবে। সংস্থার সদস্যদের টার্গেট ছিল- তারা এমন কিছু লোক তৈরি করবে, যারা মনে করবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা কিছু করছে, যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সবই সম্পূর্ণ সঠিক। শুধু তাই নয়, তারা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে যে, এই মতামত তাদের একান্তই নিজস্ব; অন্য কারো কাছ থেকে ধার করে নেয়া নয়"।

দুই শিবিরের মাঝে সংঘটিত লড়াইয়ের মূল ঘটনা হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা গোপনে ১৯৫০ সালে বার্লিনে কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম (CCF) প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের একটি জগত আবিষ্কার করা। এ লক্ষ্যে আমেরিকা ৩৫ টিরও অধিক রাষ্ট্রে অফিস দেয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপকে নিজেদের সাংস্কৃতিক বলয়ে আনার জন্যই মূলত আমেরিকার এই প্রয়াস। পাশাপাশি বিশ্বকে নেতৃত্ব দানের আবহ তৈরি এবং ঐসময়কার একক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সুযোগকে নষ্ট করাও উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে। কারণ সোভিয়েত ১৯৪৭ সালে কমিউনিস্ট ইনফর্মেশন অফিস "কমিনফোর্ম" প্রতিষ্ঠা করে। এই কমিনফোর্ম প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল, সমাজতন্ত্রের প্রসার। সাংস্কৃতিক এই যুদ্ধে ফ্রান্স প্রথম সারিতে ছিল।

এরপর ষাট দশকের মাঝামাঝিতে কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম (CCF)- স্ট্রাটেজির বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল যেমন: আফ্রিকা, আরব ভূখণ্ড এবং চীনে নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে তাদের প্রকাশনা এবং সাহিত্যকর্ম প্রচার করতে থাকে। আর এই পুরো সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিচালনার ভার থাকে নিকোলাস নবোকভ (আমেরিকায় পাড়ি জমানো একজন রাশিয়ান লেখক), মাইকেল জোসেলসন (আমেরিকান), মেলভিন জোনা লাস্কি (আমেরিকান)— এমন কয়েকজনের হাতে।

এদিকে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে যারা জেনে না জেনে এই সংস্থার হয়ে কাজ করেছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— জর্জ অরওয়েল (ব্রিটিশ), ইসাইহ বেরলিন (রাশিয়ান এবং ব্রিটিশ), জঁ-পল সার্ত্র (ফরাসি), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (আমেরিকান), সিডনি হুক (আমেরিকান), ম্যারি ম্যাকার্থি (আমেরিকান), বার্ট্রান্ড রাসেল (ব্রিটিশ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মত এমন আরও অনেকেই।

অপরদিকে যারা মার্কিন সাংস্কৃতিক এই অগ্রযাত্রার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে অথবা অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছে, তারা বিভিন্নভাবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর টার্গেটে পরিণত হয়েছে। যেমন পাবলো নেরুদা। ১৯৭৩ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা তাকে হত্যা করে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এতটাই কঠোরতা অবলম্বন করেছিল যে, তারা যেকোনো ধরনের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা, সাহিত্যকর্ম এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের যেকোনো ধরনের সক্রিয়তা ও কর্মতৎপরতাকে নজরদারির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পনার বাইরে যাতে কিছু না হয়ে যায়। কঠোর এই নজরদারি এবং নিশ্ছিদ্র গুপ্তচরবৃত্তি সহ্য করতে না পেরে সাহিত্যিকদের অনেকেই আত্মহত্যা করে। যেমন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা তাকে কঠোর নজরদারিতে রাখার কারণে সে আত্মহত্যা করে।

সাংস্কৃতিক সরঞ্জামের সাহায্যে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বহুবিধ মাধ্যম ব্যবহার করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— উপন্যাস এবং সিনেমা, ম্যাগাজিন প্রকাশ, আর্ট গ্যালারি নির্মাণ। এছাড়াও তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সম্মেলন এবং সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শুধু তাই নয়, তারা বিভিন্ন সাহিত্য উপন্যাসে সংযোজন-বিয়োজন করে অথবা বক্তব্যের মূলভাব বিকৃত করে সরাসরি সেগুলোতে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করে, যেমনটা জর্জ অরওয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস "অ্যানিমেল ফার্ম" -এ ঘটেছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন উপন্যাস এবং বইপত্রে তারা এ কাজ করেছে।

আশ্চর্যের একটি বিষয় হলো, যা লেখিকা তার গ্রন্থে ৩৭৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে—জর্জ ওরওয়েলের যে সমস্ত উপন্যাসে হস্তক্ষেপ হয়েছে এবং যেগুলো আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেছে, সে সমস্ত উপন্যাসের একটির ভূমিকায় লেখা হয়েছে— সংস্কৃতিকর্মী - যে স্বাধীন মনোবৃত্তি এবং মুক্ত মানসিকতা অনুভব করে, তার তুলনায় অর্থ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়!!!

শুধু কি তাই! জর্জ অরওয়েলকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন এক গুপ্তচর হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যার কাজ হল, মার্কিনিদের সঙ্গে অসহযোগী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করা। এ বিষয়ে লেখিকা ৩২৭ নং পৃষ্ঠায় যা বলে তা হলো—

"কিন্তু জর্জ অরওয়েল নিজেও এই যুদ্ধের পরিকল্পনা থেকে মুক্ত ছিল না। সে সর্বাবস্থায় এসবের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে প্রচার গবেষণা বিভাগে একটি তালিকা দিয়েছিল, যাতে এমন ৩৬ জনের নাম ছিল, যাদেরকে সমাজতন্ত্রের প্রতি আন্তরিক ধরা হতো কিংবা যাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা ছিল। "

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভূমিকা এখানেই শেষ নয়! বরং তারা বহু উচ্চ সাহিত্যমানের ম্যাগাজিনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সেগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেইসাথে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মোটা অঙ্কের বেতন ও বস্তুগত সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এসব ভাতা এবং সহায়তার উৎস কোথায়, তা এসমস্ত ম্যাগাজিনের দায়িত্বশীলরা এবং সেগুলোতে কর্মরত সাংস্কৃতিক কর্মীদের জ্ঞান গোচরের বাইরে ছিল না। বিষয়টা গ্রন্থে এভাবে এসেছে— "অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের আর্থিক আনুকূল্যের প্রধান নিয়ামক শক্তির রূপরেখা হলো এমন যে, কেউ কিছু করলে বিনিময় লাভ করবে। আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটি এরকম—কোনো বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে সাধারণভাবে তাদের সকলের আর্থিক আনুকূল্য গ্রহণের সুযোগ থাকবে। চাই যে উৎস থেকেই তা আসুক না কেনো! আর এভাবেই সারাবিশ্বে বিভিন্ন সংগঠন, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও কল্যাণসংঘ এমন এক বিরাট মাতৃস্তন্য-এর ভূমিকা পালন করেছে, যে কেউ ইচ্ছা করলে যা থেকে দুগ্ধ পান করার সুযোগ লাভ করতে পারে। ...অতঃপর সে নিজ কাজ করতে পারে। ...চাই সেই উৎস থেকে আনুকূল্য গ্রহণের ব্যাপারে তার সম্মতি থাক কিংবা না থাক, সেই উৎসের কথা তার জানা থাক কিংবা না থাক। কারণ সে সময়টায় বহু পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী গোপন সোনালী সুতার টানে সিআইএ-'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। "

লেখিকা এ প্রসঙ্গে তাদের একজনের ভাষায় আরো বলে—
"আমরা হাসি তামাশা এবং সাধারণ আলাপচারিতায় এ বিষয়টা নিয়ে আসতাম। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কোথাও দুপুরের খাবার খেতে গেলাম। যখন তারা বিল মেটাতে গেলো, দেখা গেলো আমরা বলে ফেললাম—না না...তোমরা বিল রেখে চলে যাও... আমেরিকান বন্ধুরা মিটিয়ে দেবে"।

পাঠক! দেখুন, মার্কিন ডলার কিরূপে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মন ও মানসকে আয়ত্ত করে নিয়েছে। অথচ তাদের দাবি হলো, তারা মুক্তমনা এবং মুক্তচিন্তার অধিকারী।

বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আরও একটা পন্থা হলো—আকর্ষণীয় নাম, চটকদার উপাধি ও মুগ্ধকর অভিধা আবিষ্কার করা। উদ্দেশ্য হলো এসব নামের অধীনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি। যেমন 'দি ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্ডিপেনডেন্ট ইউরোপ'। লেখিকা এ সংগঠন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলে—

'আল-আন্দালাস' গ্রুপ আদি মার্কিন নাগরিকদের উদ্যোগে এবং সহযোগিতায় 'দি ন্যাশনাল কমিটি ফর ইন্ডিপেনডেন্ট ইউরোপ' গঠন করে। এই সংঘটি সিআইএ-এর সর্বাধিক উচ্চাভিলাষী একটি ফ্রন্ট। ১৯৪৭ সালের ১১ ই মে যখন এটি গঠন হয়, তখন তারা যে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে তা হল—সোভিয়েত আগ্রাসন এবং সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রতিরোধকল্পে যথার্থ কর্মপরিকল্পনা এবং উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নির্বাসিত জীবনে ইহুদিদের জন্য বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা নির্মাণ। এই সংঘটি সিআইএ -এর সরাসরি দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতো। সিআইএ কোনো ডকুমেন্ট ছাড়া সংগঠনটির ৯৯ ভাগ আর্থিক খরচ বহন করত। "

পাঠক! আশা করি এ বিষয়গুলো জানার পর ধীরে ধীরে আপনার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে, কেনো পাশ্চাত্য এবং তাবেদার আরব সরকার 'মধ্যমপন্থা', 'সম্প্রীতি', 'সমতা', 'সঠিক জিহাদ' ইত্যাদি শিরোনামে এত সেমিনার ও সভার আয়োজন করে থাকে?

একসময় আমেরিকান সভ্যতা সম্পর্কে মানুষের মনে বিকৃত ধারণা ও কদাকার চিত্র উপস্থিত ছিল। আর মার্কিনীরা নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও বিষয়টা স্পষ্ট হওয়ার কারণে মানুষের সেই ধারণা দূর করতে পারেনি। যেমন কৃষ্ণাঙ্গ এবং আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে তাদের বর্ণবাদী চেতনা। তখন চলচ্চিত্র, সিনেমা এবং সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে আমেরিকান সমাজের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা শুরু করলো। এতে করে কৃষ্ণাঙ্গ ও আফ্রিকানদের ব্যাপারে যে বর্ণবাদী বাস্তবতা সেখানে বিরাজ করছে, তার বাস্তবসম্মত চিত্র ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়া শুরু করলো। সংস্কৃতিচর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের অনর্থ ও দুষ্কৃতি আড়াল করার জন্য যেসব কর্মকৌশল আজ পর্যন্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে মূল্যায়িত হয়ে এসেছে, তন্মধ্যে এটা অন্যতম"।

এ বিষয়ে লেখিকা তার গ্রন্থে এভাবে আলোচনা করেছে—

"আমেরিকায় বিরাজমান বর্ণবাদ - সোভিয়েত প্রচারণায় খুব বেশি গুরুত্ব পায়। যার দরুন পশ্চিমাবিশ্ব এ বিষয়ে সংশয়ে পড়ে যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্ব জুড়ে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আসলেই সে সক্ষম কিনা? তাই, এসমস্ত বিধ্বংসী ধারণা নির্মূল করার লক্ষ্যে এমন কিছুর প্রয়োজন ছিল, যদ্দরুন ইউরোপ জুড়ে আফ্রিকানদের সব রকম অধিকার মার্কিনীরা নিশ্চিত করছে বলে বোঝা যাবে। আর এ কারণে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের একটি বিল পাস হয়েছে। এই বিলটি জার্মানিতে প্রচার করার জন্য একদল আফ্রিকান গায়ককে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে সেখানে পাঠানো হয়। আফ্রিকান শিল্পীদের এই প্রচার ও বিজ্ঞাপন সাংস্কৃতিক শীতল যুদ্ধের দায়িত্বশীলদের সামনে মোক্ষম উপায় হয়ে দেখা দিয়েছিল।"

লেখিকা এ প্রসঙ্গে আরো বলে—

" 'আলসপ্প'-এর গোপন রিপোর্টগুলো পাঠ করলে পাঠক হতবাক হয়ে যাবেন। চলচ্চিত্র জগতে সিআইএ -এর অনুপ্রবেশ এবং গোপন তৎপরতা কতটা গভীরে, তা রিপোর্টগুলোতে উঠে এসেছে। অথচ সিআইএ প্রতিনিয়ত বলে যাচ্ছে, তারা এধরনের কিছুই করছে না"।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে "চলচ্চিত্র জগতে কৃষ্ণাঙ্গরা" শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হলিউডে আফ্রিকানদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে গৎবাঁধা নিয়মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে সে। 'আলসপ্প' তাতে বলে—আমেরিকান সমাজচিত্রের অংশ হিসেবে আফ্রিকানরা উন্নত পোশাক পরিধানের ব্যাপারে, বহু চলচ্চিত্র প্রযোজকের সম্মতি লাভ করেছে। তবে সেটা যেন রুচি বিরোধী না হয় এবং ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত হয়েছে বলে মনে না হয়, সেদিকেও তারা সবিশেষ দৃষ্টি রাখে। "আশশারাবুল মুসকার" চলচ্চিত্র, যা এখন নির্মিত হচ্ছে—দুর্ভাগ্যবশত তাতে এ কাজটি করা যায়নি। কারণ যত রকম ঘটনা সবই ঘটে থাকে দক্ষিণাঞ্চলে। চলচ্চিত্রটিতে অচিরেই কৃষক শ্রেণীর আফ্রিকানদেরকে দেখা যাবে। তবে চলচ্চিত্রটির এই শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থা যেকোনো উপায়ে করে ফেলা হবে। তা হতে পারে এভাবে যে, কোনো একজন বড় কর্মকর্তার বাড়িতে কাজের লোকদের মধ্যে প্রধান হিসেবে সম্মানজনক একটি চরিত্র দেয়া হলো একজন আফ্রিকানকে। যেসব সংলাপে তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে, সেখানে এমন একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে তাকে উপস্থাপন করা হবে, যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার যার রয়েছে।"

পাঠক! অনুমান করতে পারছেন তো, সময়ে সময়ে মার্কিন প্রশাসন তাদের কাছে থাকা কিছু কিছু বন্দী মুসলিমের বন্দীত্বের চিত্র সহনীয় আকারে কেনো প্রকাশ করে থাকে? আসলে এর উদ্দেশ্য হলো, গুয়ানতানামোবে, আবু গারিব ইত্যাদি কারাগারগুলোর নিষ্ঠুর চিত্র যেন মানুষের মন থেকে মুছে যায়। একইভাবে শাইখ আবু আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ'র ট্র্যাজেডিও যেন মানুষ ভুলে যায়।

‘দি কালচারাল কোল্ড ওয়ার’ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার এখানেই ইতি টানছি। এ পর্যায়ে এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা করব, যেগুলো মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য মুসলিম উম্মাহর চিন্তাবিদ ও বিদ্বান মহল প্রণয়ন করেছিলেন। উম্মাহকে বাঁচাতে এবং তাদেরকে সতর্ক করতে তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা করে গেছেন। উস্তাদ আল্লামা মাহমুদ শাকের রহিমাহুল্লাহ ‘আবাতিল ওয়া আসমার’ গ্রন্থের ৭ নং পৃষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেয়া ভ্রান্ত চিন্তাধারার কুপ্রভাব উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—

“এই রচনাগুলো লেখার পেছনে আমার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, যদিও সে উদ্দেশ্য পূরণের আরো অনেক পন্থা রয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হলো—আমার স্বজাতি আরব ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আর এক্ষেত্রে আমি নিজের জন্য এই পন্থা বেছে নিয়েছি যে, অতীতে যারা বিভ্রান্তিকর মুখোশ পরিধান করে অপসংস্কৃতির পক্ষে কাজ করে গেছে এবং আজও যাদের উত্তরসূরিরা সে ধারা অব্যাহত রেখেছে—তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেব। তাদের সকলেরই লক্ষ্য হলো, আমাদের চিন্তা-চেতনায় পৌত্তলিক পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করে আমাদের সমাজ, জীবনাচার এবং সংস্কৃতি — সর্বত্র ওই পশ্চিমা অপসংস্কৃতির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর এভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের সুদীর্ঘকালের পরিশ্রমে নির্মিত বিরাট কাঠামোকে তারা ধসিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। আমার এই কিছু লেখা চলমান এই যুদ্ধের সবচেয়ে স্পর্শকাতর, সবচেয়ে ভয়াবহ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ফ্রন্টলাইনের কিছু বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলবে। আর তা হচ্ছে সাহিত্য-সংস্কৃতির ফ্রন্ট। চিন্তা ও দর্শনের যুদ্ধক্ষেত্র।

এর ভয়াবহতা আরো বেড়ে গেছে যখন আমাদের মধ্য থেকেই কিছু লোক এই যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের উত্তরসূরিরাও আমাদের মধ্য থেকেই বের হয়েছে। তারা ও আমরা একই বর্ণের। তাদের ও আমাদের ভাষা অভিন্ন। তাদের ও আমাদের চর্মচক্ষু একই ধরনের। তারা আমাদের মাঝেই নিরাপদে চলাফেরা করছে। ভৌগলিক জাতীয়তা, ধর্ম, ভাষা, জাতিসত্তা—সর্ব বিচারে তারা এবং আমরা একই সূত্রে গাঁথা। এ মানুষগুলোই আমাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

উস্তাদ মুহাম্মদ হুসাইন রহিমাহুল্লাহ حصوننا مهددة من الداخل গ্রন্থের ১১ নং পৃষ্ঠায় মুসলিম বিশ্বের প্রতি আমেরিকার নগ্ন চাহনি, বাস্তবতা বিবর্জিত ছদ্মবেশী তথাকথিত সুশীলদের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে প্রতারিত করার বিষয়গুলো তুলে ধরে এবং আমেরিকানদের খরচ করা অর্থ যে এই উম্মতের কোনো উপকার বয়ে আনবে না, সে বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে বলেন—

“এতদাঞ্চলের প্রতি আমেরিকার লালসা আজ প্রকাশ্য। এর প্রকৃত রক্ষক শক্তি; যারা একে রক্ষার অতন্দ্র প্রহরায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং স্বজাতিকে জাগিয়ে তোলার নিরন্তর সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন, তাদের প্রতি আমেরিকার শত্রুতা আজ স্পষ্ট। এ বিষয়ে নতুন করে বলার কিছুই নেই। এই উম্মাহর শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ, বিভিন্ন চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা; বলা হয়ে থাকে এসবের দ্বারা উদ্দেশ্য হল—শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং নতুন প্রজন্মের পরিশুদ্ধি। অথচ আদতে তা এমন একটা বিষয়, যা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারে না। মার্কিনীরা এই উম্মাহকে গ্রাস করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক গোপন-প্রকাশ্য যত রকম চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যয় করছে, তার সঙ্গে তাদের এমন বক্তব্য কোনোভাবেই যায় না।

যারা মার্কিন সভা ও সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণ করে, যারা বিভিন্ন মার্কিন প্রচারাভিযানে সহযোগিতা করে থাকে, যার সবগুলোতেই সন্দেহজনক উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে, তারা আমাদের মেধা বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্রুপ করে। এসব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা জাতির সেবা করছে, এমন দাবি করতে গিয়ে তারা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করে। কারণ এসব প্রোগ্রামে, সেমিনারে, কনফারেন্সে এই যে অঢেল পরিমাণ মার্কিন ডলার খরচ করা হচ্ছে, তা কখনোই এ জাতির কল্যাণ ও উপকারের জন্য হতে পারে না”।

আমি উস্তাদ মাহমুদ শাকের এবং উস্তাদ মুহাম্মদ হুসাইন —এই দুই মনীষীর এত দীর্ঘ উদ্বৃতি উল্লেখ করেছি কারণ, তারা উভয়ে মুসলিম উম্মাহর প্রতিরোধ-যুদ্ধে এবং শত্রুপক্ষের চক্রান্ত ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। যদি বলা হয়, পর্বতসম এই দুই ব্যক্তিত্বের অবদান মুসলিম উম্মাহর একাধিক সামরিক ব্রিগেডের অবদানের চেয়ে কম নয়, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ করে حصوننا مهددة من الداخل গ্রন্থখানা ছদ্মবেশী বহু পর্যটক, উম্মাহর অবস্থার পরিদর্শক বহু লোকের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লজ্জিত করেছে, যারা মূলত রাষ্ট্রীয় গুপ্তচর ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিশেষে বলতে চাই, এ বিষয়ের আলোচনা অনেক দীর্ঘ, একটি অথবা দুটি প্রবন্ধে যা পুরোপুরি নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং অধ্যয়ণ। তাই বিশেষজ্ঞ ও গবেষক মহলের কাছে আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই, আপনারা আরবি এবং অন্যান্য ভাষার উৎস সমূহ থেকে গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে এবং বিশেষভাবে মুজাহিদদেরকে সংস্কৃতির এই অঙ্গনে সঠিক দিক নির্দেশনা দান করবেন। পাশাপাশি ডলারের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করে যারা মুসলিমদের কাতারে ঘাপটি মেরে আছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে উম্মাহকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। আর যারা নিজেদের অজ্ঞাতে এগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে; তাদের মাঝে বিশেষভাবে আলেম, দাঈ এবং মুসলিমদের কল্যাণকামীদের কথা আমি উল্লেখ করতে চাই, যারা সংখ্যায় অনেক —তাদেরকে আপনারা জাগ্রত করবেন।

এক কথায়, সচেতনতার যুদ্ধে আপনারা সর্বান্তকরণে নিয়োজিত থাকবেন। কারণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মুনাফিকদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে জানেন, যারা আমাদের চেহারার হয়েও আমেরিকাকে সাহায্য করে যাচ্ছে। যারা ইহুদী গোষ্ঠী এবং বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডারদের সেবাদাস হয়ে আছে। যারা আমাদের মুসলিম সমাজগুলোতে পশ্চিমা কুফরি লিবারেলিজম আমদানি করে চলেছে। আমরা কেবল আল্লাহকে আঁকড়ে থাকতে চাই এবং এককভাবে তাঁর ওপর ভরসা করি।

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন’। [সূরা তালাক, ৫৫: ২-৩]

> "যারা মার্কিন সভা ও সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণ করে, যারা বিভিন্ন মার্কিন প্রচারাভিযানে সহযোগিতা করে থাকে, যার সবগুলোতেই সন্দেহজনক উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে, তারা আমাদের মেধা বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্রুপ করে। এবং এসব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা জাতির সেবা করছে, এমন দাবি করতে গিয়ে তারা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করে। কারণ এসব প্রোগ্রামে, সেমিনারে, কনফারেন্সে এই যে অঢেল পরিমাণ মার্কিন ডলার খরচ করা হচ্ছে, তা কখনোই এ জাতির কল্যাণ ও উপকারের জন্য হতে পারে না"।

বিপ্লবের কেন্দ্র থেকে কয়েক পলক দৃষ্টিপাত

সালিম আশ-শরীফ

বিপ্লবের রয়েছে এক অবর্ণনীয় সুবাস। পুরো আবহাওয়ার রয়েছে এক আলাদা স্বাদ। খোলা চোখে আজ রং এর বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ইতিপূর্বে যা দেখা যায়নি। সবকটি দৃশ্যই চিত্তাকর্ষক। সতেজ, সহাস্য, সমুজ্জ্বল চিত্রগুলোর সৌন্দর্য্য অম্লান দ্যুতি ছড়িয়ে হাসছে। সবকিছুকেই উৎকৃষ্ট আর সুপ্রসন্ন ভাগ্যের প্রতীক মনে হচ্ছে। বিস্ময়কর নির্মল ও পবিত্র সুরে আজান শোনা যাচ্ছে। প্রতিটি আওয়াজই অদ্ভুত সুমিষ্ট আর মায়াবী; পাখির গানের গলায় যেন সুরের মিষ্টতা আগের চেয়ে বেশি ঝরছে।

খাবারেও যেন অভূতপূর্ব স্বাদ অনুভূত হচ্ছে। তাতে রয়েছে এমন পুষ্টি, যা নিষ্কলুষ, পবিত্র ও উৎকৃষ্ট মানের চালচলনে সহায়তা করছে। সম্মান ও আত্মমর্যাদার গভীর অনুভূতি মনে দোলা দিচ্ছে। অফুরন্ত নেয়ামত প্রাপ্তির অনুভূতি আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিচ্ছে। লাবণ্যময় এক স্বচ্ছ মনোবৃত্তি আগ্রহ ভরে বিশ্বস্রষ্টা রবের দরবারে কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ার সেজদা আদায়ে অনুপ্রাণিত করছে। নিঃসন্দেহে এই সবকিছু হলো স্বাধীনতার প্রাপ্তি ও নিয়ামাহ। কারণ লাঞ্ছনাকর মানব দাসত্বের শক্তি আজ খর্ব হয়ে গেছে। মানব সমাজ আজ থেকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব কিছুকে বর্জন করে একমাত্র তাঁরই দাসত্বের স্বাদ আস্বাদন করবে। তাঁরই দাসত্বের মহিমায় অবগাহন করবে। মানব মুক্তির সার্থকতা এখানেই। স্বাধীনতার প্রকৃত বাস্তবায়ন এটাই।

যেকোনো বিপ্লব যখন সাফল্যের একেকটি শিখরে উন্নীত হতে হতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তখন বিপ্লব পরিচালনাকারী প্রজন্মের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই সে রাষ্ট্রযন্ত্রের গতিধারা নির্ণীত হয়। বিপ্লবী প্রজন্ম যদি ভয়-ভীতি, সংশয়-সন্দেহ, হিংসা-বিদ্বেষের মাঝে বেড়ে ওঠে, তবে সে রাষ্ট্রটি একটি জড় রাষ্ট্রে পরিণত হয়; তৃতীয় কোনো সহযোগী নিয়ামক শক্তির মধ্যস্থতা অথবা বিরোধীদের স্বেচ্ছাচারিতার যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া ছাড়া এমন রাষ্ট্রের সবিশেষ কোনো পরিবর্তন সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় সে রাষ্ট্রে নানাবিধ অসঙ্গতি দেখা দেয়; যা রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরকে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। এমন রাষ্ট্রে যেন প্রতিনিয়তই বিপ্লব চলমান! নিশ্চয়ই এটি একটি ক্ষণস্থায়ী রাষ্ট্র এবং যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া এমন রাষ্ট্র অর্ধশতাব্দী টিকে থাকাটাও অসম্ভব। আর বিপ্লবকারী প্রজন্মটি যদি সুযোগসন্ধানী, সুবিধাবাদী এবং নিম্ন মানসিকতার হয়, তবে নবজাতক রাষ্ট্রটি এই নিম্ন মানসিকতার অনিষ্ট ও মানবিক সংকীর্ণতার নাগপাশ থেকে কখনোই বেরোতে পারে না। অনিবার্যভাবে এমন রাষ্ট্র সামাজিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে যতক্ষণ না তা অন্য কোনো পথ খুঁজে পায়।

বিপ্লবকালীন প্রজন্মটি যদি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দাসত্ব ও শাসন-শোষণের মাঝে লালিত পালিত হয়, তবে তাদের উন্নতি অগ্রগতির জন্য বহিরাগত সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় যদি তাদের নেতৃত্বের আসনে উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায়, তবে খুব দ্রুতই তারা পূর্বের সমস্ত রীতিনীতি থেকে বের হয়ে আসে। আর তেমন কিছু যদি না হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম আসার আগ পর্যন্ত তারা অগ্রগতির পথে হাঁটতে ব্যর্থ-ই থেকে যায়। পরবর্তী এমন প্রজন্মের কথা বলছি, যারা বিপ্লবের আবহে বেড়ে উঠেছে অথবা অন্তত বিপ্লবী পরিবেশে জন্মলাভ করেছে। বিপ্লবী জনগোষ্ঠী যদি উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, এরপর বিভিন্ন দিক দেখেশুনে একটা পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে এদেরকে বলা যায় ভার্চুয়াল জেনারেশন; তাদের পিতৃপুরুষদের অবস্থা হল তারা দিবাস্বপ্নে ডুবে ছিল আর বর্তমানে তারা নিজেরা অনলাইনে কৌশলগত লড়াইয়ের নেশায় মত্ত। বিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রজন্মটি যদি সুদৃঢ় মূলনীতি এবং সত্য-সঠিক মতাদর্শের ওপর বেড়ে ওঠে, তারা যদি নবীগণের আদর্শে লালিত পালিত হয়, নবীগণের ঐশী জ্ঞানের বৃষ্টিতে বিধৌত হয়, তাঁদের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার আদর্শে প্রতিপালিত হয়; সেই প্রজন্ম যদি নবীগণের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষের সুধা পান করে থাকে,

তারা যদি নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে, তবে নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার আবেষ্টনী থেকে এমন প্রজন্মের বের হওয়া এবং তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের মূলসূত্র হচ্ছে আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধন। কারণ অচিরেই এই প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ নিজেদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।

বিপ্লব পরিচালনাকারী প্রজন্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যদি বিভিন্ন ধরনের হয়, তবে বিপ্লবকালীন তাদের আচরণ ও চরিত্রের মাঝেও তফাৎ দেখা দেয়। বৈপ্লবিক পরিবেশ ও আবহাওয়া প্রজন্মের সদস্যদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তিশালীকরণের একটি সুযোগ এনে দেবে—এটা সম্ভব। কিন্তু প্রজন্মের সকল সদস্য এক পতাকাতলে সমবেত হবে, এটা কেবল কঠিনই নয় বরং অসম্ভব। বিপ্লবোত্তর সময়ে লোভ-লালসা কত দ্রুত তাদেরকে পরস্পর হানাহানি, বিবাদ, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এমনকি রক্তপাতের দিকেও নিয়ে যায়, তা কে না জানে! এই অবস্থায় বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে - ঐ সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর; তাদের বুঝ-বিবেচনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ চিন্তার উপর। তাই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলের জন্য আবশ্যক হল, স্বার্থ ও সুবিধার জলাশয়ে বিপ্লবের ফলাফল পিছলে পড়া এবং বিরাট এই কর্মযজ্ঞ বৃথা যাবার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সে কাদের সঙ্গে থাকবে এবং কাদেরকে সাহায্য করবে? কারণ কেবল জনগণের পক্ষেই সম্ভব, নিজ ইচ্ছা শক্তি দ্বারা বিপ্লবের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করা। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার প্রজন্মের সদস্যদের হাতেই ন্যস্ত যে, তারা সৌভাগ্যের রাজপথে হাঁটবে নাকি দুর্ভাগ্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হবে!

قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

‘তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই’। [সূরা আনআম, ৬: ১০৪]

> যেকোনো বিপ্লব যখন সাফল্যের একেকটি শিখরে উন্নীত হতে হতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তখন বিপ্লব পরিচালনাকারী প্রজন্মের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই সে রাষ্ট্রযন্ত্রের গতিধারা নির্ণীত হয়। বিপ্লবী প্রজন্ম যদি ভয়-ভীতি, সংশয়-সন্দেহ, হিংসা-বিদ্বেষের মাঝে বেড়ে ওঠে, তবে সে রাষ্ট্রটি একটি জড়, সম্ভাবনাময় ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়; তৃতীয় কোনো সহযোগী নিয়ামক শক্তির মধ্যস্থতা অথবা বিরোধীদের স্বেচ্ছাচারিতার যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া ছাড়া এমন রাষ্ট্রের সবিশেষ কোনো পরিবর্তন সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় সে রাষ্ট্রে নানাবিধ অসঙ্গতি দেখা দেয়; যা রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরকে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। এমন রাষ্ট্রে যেন প্রতিনিয়তই বিপ্লব চলমান! নিশ্চয়ই এটি একটি ক্ষণস্থায়ী রাষ্ট্র এবং যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া এমন রাষ্ট্র অর্ধশতাব্দী টিকে থাকাটাও অসম্ভব।

দ্বিতীয় পর্ব

ধ্বংসের মুখে আমেরিকান অর্থনীতি

মুহসিন রুমী

পূর্বের প্রবন্ধে আমরা আমেরিকান অর্থনীতির উপর ১১ সেপ্টেম্বর হামলার কিছু সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এবং শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছি যে, আমেরিকান অর্থনীতির উপর আঘাতের মাধ্যমে কার্যকরীভাবে শত্রুকে দুর্বল করা সম্ভব। আর প্রবন্ধটি সমাপ্ত করেছিলাম উম্মাহর সকল সদস্যদের প্রতি, বিশেষতঃ স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন নির্বাচিত ও প্রতিভাবান লোকদের প্রতি এই আহ্বান রেখে যে, তারা যেন নিজেদের সময় ও চিন্তার একটি অংশ এই গবেষণায় নতুনত্ব আনার জন্য ব্যয় করেন যে, কোন কোন ছিদ্রপথে আমেরিকান অর্থনীতির উপর আঘাত হানা যায়? সেই মিশন পূর্ণ করার জন্য, যা শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর সাথীগণ শুরু করেছিলেন। তাঁরা সর্বদাই আন্তর্জাতিক কুফরের মোকাবেলায় এ কৌশলটির উপর গুরুত্ব দিতেন।

বর্তমান বাস্তবতায় গোপনীয়ভাবে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী মুজাহিদগণের জন্যও এ সুযোগ আছে। চাই পুরুষ হোন বা নারী বা তরুণ অথবা শহুরে হোন বা গ্রাম্য, প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত আবিষ্কার এবং আল্লাহ তার কাছে জ্ঞানের যে রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন, তার মাধ্যমে এগিয়ে আসতে পারেন। শর্ত হলো, তারা মুজাহিদগণের সাধারণ প্ল্যানিং তথা ইলেক্ট্রনিক জিহাদি কর্মশালার আওতাভুক্ত হবেন।

প্রবন্ধের বিস্তৃত পরিসর ও নিরাপত্তার দিক থেকে বিষয়টির স্পর্শকাতরতা অনুপাতে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। তবে সে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বহুল উত্থাপিত দু'টি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তা হলো:

১। কেনো আমেরিকার উপর আঘাতের প্রতি এতোটা গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে?

২। কেনো আমেরিকার অর্থনীতির উপর আঘাতের প্রতি এতোটা গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক যে, আমেরিকানদের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ আদৌ এটা নয় যে, মুসলিম উম্মাহর উপর চেপে বসা বাকি শত্রুদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। যারা মুজাহিদগণের যুদ্ধনীতি পর্যবেক্ষণ করেন, তারা মুজাহিদদের প্রতিটি ময়দানে পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার দক্ষতা পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারেন। আর তা হলো, উপস্থিত রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ শত্রুর মোকাবেলা করা এবং যখনই প্রয়োজন ও যতটুকু উপকারী মনে হয়, সে অনুযায়ী শত্রুকে সাহায্য বঞ্চিত ও নিরপেক্ষ করার রাজনীতি জারি রাখা। তবে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বলব, এটা এ কথারও বিরোধী নয় যে, এই দশকে মুসলিমদের প্রথম শত্রু হলো আমেরিকা। কারণ তারাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশে দখলদারিত্ব করছে, উম্মাহর সম্পদগুলো লুট করছে, কুফর ও নাস্তিকতা প্রসার করছে, মুসলিম দেশগুলোতে শাসনকারী তাগুতদেরকে সাহায্য করছে এবং ফিলিস্তিনে লুণ্ঠনকারী শক্তিকে সমর্থন দিচ্ছে। কেউ আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে জিহাদি উলামা, নেতৃবৃন্দ, চিন্তাবিদ ও ভাষ্যকারদের লিখিত জিহাদি সংগঠনসমূহের আচরণবিধিগুলো এবং তাদের বিভিন্ন মিডিয়া সেন্টারের প্রকাশনাগুলো দেখতে পারেন।

এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নে- কেনো আমেরিকার অর্থনীতির উপর আঘাতের প্রতি এতোটা গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে?

যেহেতু বিশ্বের উপর মার্কিন প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার জন্য এটাই দ্বিতীয় বাহু হিসাবে পরিগণিত হয়, যার প্রথম বাহু হলো বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী সামরিক অস্ত্রাগার। এমনকি কখনো কখনো অর্থনৈতিক প্রভাবটিই সামরিক প্রভাবের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়। যারা যুদ্ধ-লড়াইয়ের পরিস্থিতিগুলো পর্যবেক্ষণ করেন, তারা স্পষ্টভাবেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবেন। আমেরিকা নিজ অর্থনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো, তার সাথে প্রতিযোগিতাকারী রাষ্ট্রগুলো, এমনকি তার সাথে যুদ্ধকারী রাষ্ট্রগুলোর উপরও নিজ নির্দেশনাগুলো চাপিয়ে দেয়। আর কর্মচারী রাষ্ট্রগুলো (যার অধিকাংশই মুসলিম রাষ্ট্র) তারা তো দুধের গাভীর মতো, যারা আমেরিকার আনুগত্য করা এবং তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর সম্পদগুলোর উপর কর্তৃত্ব দেওয়াকেই নিজেদের ধর্ম মনে করে।

সামনের কয়েকটি পয়েন্টে বিশ্বের অর্থনীতির উপর মার্কিন অর্থনীতির কর্তৃত্বের কিছু নিদর্শন উল্লেখ করার চেষ্টা করব:

- আন্তর্জাতিক জ্বালানি মার্কেট নিয়ন্ত্রণ এবং ডলারের মাধ্যমে পেট্রোলের মূল্য নির্ধারণ আবশ্যক করা।

- বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলোর উপর ব্যাংক ও অর্থনৈতিক কোম্পানিগুলোর প্রভাব। আর ৮৩% এরও অধিক মুদ্রা বিনিময় ডলারের মাধ্যমে হওয়ার কারণে প্রথম মুদ্রা হয়ে গেছে ডলার।

- তথ্য প্রযুক্তির মাঠে আমেরিকার কর্তৃত্ব। আমেরিকাই নতুন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও ডিজিটাল শিল্পে এককভাবে কর্তৃত্ব করছে। আমেরিকাই সকল ইন্টারনেট সাইট, দ্রুতগামী তথ্য-মাধ্যমসমূহ, আধুনিক অর্থনীতি, মিডিয়ার রাজা (মাইক্রোসফট, ইবিএম, ইন্টেল) ও ইন্টারনেট সম্রাট (ইয়াহু, অ্যামাজন) ইত্যাদির একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী দেশ।

- পরিসেবা ও বিনোদন শিল্পসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ, যা দ্বারা বিশ্বের জনগণের মন ও পকেট জয় করেছে।

- এই প্রভাবের বাস্তবতা বুঝার জন্য আমাদের এটা জানাই যথেষ্ট যে, এককভাবে আমেরিকার সাধারণ উৎপাদন; জাপান, জার্মান, ভারত, ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সমষ্টিগত উৎপাদন থেকে বেশি।

মোটকথা, আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ইলেক্ট্রনিক জিহাদ এবং কুফুরী বিশ্ব ও তার প্রধান আমেরিকাকে টার্গেট করার ফরজ দায়িত্ব। এক্ষেত্রে এটা বলাই বাহুল্য যে, আমেরিকান অর্থনীতি বিশ্বের অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। আমেরিকান স্বার্থ প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে আছে। আর তা সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে আছে ভার্চুয়াল জগতে। এটা হলো তাদের দুর্বল পয়েন্ট। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেটের উপর ভরসা এবং তার সাথে সংযুক্ত মাধ্যম সমূহের উপর ভরসা; এটাই তাদের ভয়ংকর দুর্বলতার পয়েন্ট। এটা এমন প্রত্যেকের জন্য বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, যারা আমেরিকাকে টার্গেট করতে বা তার ক্ষতি সাধন করতে চায়। এর বিস্তৃতি যত বৃদ্ধি পাবে, আক্রমণের সুযোগও তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কী পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি হবে, বিশেষ করে ভার্চুয়াল জগতে- তা স্পষ্ট করার জন্য আমরা আপনাদের সামনে নিম্নোক্ত অর্থনৈতিক সংবাদগুলো বর্ণনা করব, যা সম্প্রতি পশ্চিমা মিডিয়া জগতে ব্যাপকভাবে আলোচিত। এটি শুধু আমেরিকান একটি বড় কোম্পানির সংবাদ, যার মাধ্যমে আমেরিকা সারা বিশ্বের সাথে অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তা হলো, অ্যামাজন কোম্পানি। নিম্নোক্ত রিপোর্টে এসেছে:

গত বছরের শেষে করা জাতিসঙ্ঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের অর্ধেক জনগণ এখনো ইন্টারনেট সেবার সাথে যুক্ত নয়। অ্যামাজনের সর্বশেষ টার্গেট হলো এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। তাই অ্যামাজন একটি ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে, যা মূল গ্রহটিকে ঘিরে রাখবে এবং বিশ্বের যেকোনো পয়েন্টে সর্বোচ্চ গতির ইন্টারনেট সুলভ মূল্যে প্রদান করবে। তারা এই প্রজেক্টের নাম দিয়েছে -‘ কুইপার প্রজেক্ট’ (Kuiper project)।

এ ধরণের প্রোগ্রামগুলো মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের জন্য আন্তর্জাতিক জিহাদে অংশগ্রহণের বিরাট সুযোগ তৈরি করে দেয়। মুসলিমদের মধ্যে যারা ভার্চুয়াল জগতের সাথে সম্পৃক্ত, বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ও অভিজ্ঞ, তাদের কাজ হলো শুধু কোমর বেঁধে নামা এবং জিহাদের কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া। আর আল্লাহর উপর ভরসা করা। ইলেক্ট্রনিক জিহাদ শুরু হলে এটা যুগের ফেরাউন আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য আমাদের জাতির উপর সীমালঙ্ঘন করা, আমাদের দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা করা এবং আমাদের সম্পদসমূহ লুট করার পথে বাঁধা হবে। পক্ষান্তরে, উম্মাহর যে সকল সন্তানগণ প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় বিশেষত্ব অর্জন করার প্রতি মনোযোগী আমরা তাদেরকে আহ্বান করব, ঐ সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের প্রতি মনোযোগ দিতে, যা মুসলিম জাতির জন্য একটি ইলেক্ট্রনিক যোদ্ধা সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে; যাদের মাধ্যমে আমরা কাফের জাতিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আর আল্লাহর নিকট এটা দুরূহ ব্যাপার নয়।

এ ধরণের জিহাদর ময়দানে কাজের সম্ভাব্যতা বেশি,একই সাথে অধিক ফলপ্রসূ। আপনাদের জন্য একজন সাবেক মার্কিন দায়িত্বশীলের সাক্ষাৎকার তুলে ধরব, যে এ শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ। সে হচ্ছে এডমিরাল মাইকেল ম্যাক কোনেল, সাবেক আমেরিকান দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান।

এডমিরাল মাইকেল: আমি যদি এমন কোনো ইলেক্ট্রনিক যোদ্ধা হতাম, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ক্ষতি সাধন করতে চায়, তাহলে আমি হয়ত শীতকালে সর্বোচ্চ ঠাণ্ডাকে অথবা গরমকালে সর্বোচ্চ গরমকে বেছে নিতাম। পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য অনেক সময় পূর্ব উপকূলে, কিংবা কখনো পশ্চিম উপকূলে বৈদ্যুতিক শক্তির নেটওয়ার্ক অচল করে দিতাম। এ সবগুলো বিষয়ই একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধার জন্য সম্ভব।

মিডিয়া: আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন যে, যারা আমাদেরকে অপছন্দ করে, তারা বৈদ্যুতিক শক্তির নেটওয়ার্ক অচল করে দিতে পারবে?

এডমিরাল মাইকেল: হ্যাঁ, আমি এটা বিশ্বাস করি।

মিডিয়া: এ ধরণের আক্রমণের জন্য কি যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত?

এডমিরাল মাইকেল: না, যুক্তরাষ্ট্র এ ধরণের আক্রমণ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত নয়।

স্বাভাবিকভাবেই এটি একটি বড় টার্গেট, যার জন্য অনেক পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু কিছু সহজলব্ধ ও নাগালের ভিতরের টার্গেট আছে, এমনকি তার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুজাহিদগণ অনেক চক্কর অতিক্রম করেও ফেলেছেন। ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞগণ এ টার্গেট গুলোকে মুজাহিদগণের সামর্থ্যানুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যা নিম্নরূপ:

১। গঠনমূলক সামর্থ্যগুলো:

এ প্রকারটি ইন্টারনেট ভিত্তিক সে সকল কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা জিহাদি জামাতকে সাহায্য করে। যেমন-

- নিজেদের মিডিয়া প্রকাশনাগুলোর মাধ্যমে জিহাদের দাওয়াত ও গাইড-লাইন দেওয়া। সেগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক জনগণের কাছে পৌঁছানো, উম্মাহকে ও তার যুবকদেরকে প্রশিক্ষিত করা এবং উম্মাহর সন্তানদের অন্তরে হারানো ফরজকে পুনরুজ্জীবিত করা।

- উম্মাহর যুবকদের শক্তিগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো এবং আন্তর্জাতিক কুফুরী শক্তিগুলোর উপর আঘাত হানার জন্য তাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

- তথ্য উদঘাটন।
- যোগাযোগ।
- উম্মাহর সেনাবাহিনীর সামরিক প্রবন্ধ ও আলোচনাসমূহ প্রচার করা এবং উম্মাহর সন্তানদের জন্য যেকোনো স্থান থেকে জিহাদি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে সহজ করে দেওয়া।

- পশ্চিমা প্রোপ্যাগান্ডার মোকাবেলা করা এবং তাদের মিথ্যাচারিতা সুস্পষ্ট করা। কোনো পর্যবেক্ষকের জন্য, প্রথমবার ইরাক যুদ্ধে মিডিয়ার ধামাচাপা দেওয়ার অবস্থা, যেখানে শুধু পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ধামাচাপা দেওয়ার কাজ করেছে আর দ্বিতীয়বার ইরাক যুদ্ধে মিডিয়ার ধামাচাপা দেওয়ার অবস্থা ও তাতে জিহাদি মিডিয়ার ভূমিকার মাঝে তুলনা করলেই পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

- জিহাদি চেতনা উম্মাহর মাঝে বিস্তার করা এবং প্রত্যেকে নিজ অবস্থানে থেকে আন্তর্জাতিক কুফরের মোকাবেলায় এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

আল্লাহর অনুগ্রহে এই ভাগটি বিশাল সফলতা অর্জন করে ফেলেছিল, যা বন্ধুদের পূর্বে শত্রুরাই সাক্ষ্য দিয়েছে । যদিও তাতে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, ঠিক তখন বাগদাদীর খারেজি জামাতের অপরাধ যজ্ঞের কারণে এই ভাগটি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তারা এই বিশাল জিহাদি ক্ষেত্রটি নষ্ট করে দেয় এবং অনেক বছর যাবত এই ফিল্ডটি

তৈরি করা ও তার ভিত্তিগুলো শক্তিশালী করার জন্য যে ধারাবাহিক চেষ্টা ও পরিশ্রম চলে আসছিল, তা বিক্ষিপ্ত করে দেয়। মুজাহিদগণের কয়েক প্রজন্মের কুরবানীকে নষ্ট করে দেয় এবং বিকৃতি ও পথভ্রষ্টতার স্তর থেকে দালালির স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এর ক্ষতিগুলো অন্যান্য ময়দানের মত এ ময়দানেও অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে আছি যে, এটা হলো বুদবুদ, যা খুব শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাদের অনিষ্ট ও অপরাধগুলো প্রতিহত করুন! তাদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ করে দিন এবং তাদের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট না রাখুন!

আলহামদুলিল্লাহ, এ ভাগটি আস্তে আস্তে হলেও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাকে উত্তমভাবে পূর্ণতা দান করুন! এ প্রেক্ষাপটে আমরা এ ময়দানের ঐ সকল নবীন-প্রবীণ কর্মীদেরকে আহ্বান করব, যারা অপরাধী খারেজি বাগদাদী ও তার জামাতের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন, তারা যেন তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক চেতনায় ফিরে আসেন। নিজ রবের দরবারে তাওবা করেন। সঠিক পথে ফিরে আসেন এবং অপরাধী দলটি যা নষ্ট করে দিয়েছে, তা সংস্কার করতে নিজ ভাইদের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

২। বিরানকরণের সামর্থ্যগুলো:

এ ভাগটি ইন্টারনেট ভিত্তিক ওই সকল কর্মকাণ্ডগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা নেটওয়ার্ক জগতে সক্রিয় ইন্টারনেট হ্যাকিংয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে শত্রুদের তথ্যগুলো প্রযুক্তিগতভাবে নষ্ট করে দেয়। যেমন: বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়া, সরকারি সামরিক ও বেসামরিক সাইটগুলো এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও মিডিয়া কোম্পানিগুলোর সেবামূলক সাইটগুলো হ্যাক করে ডিজিটাল তথ্য ফাঁস করা, ব্যাংকের তথ্যভাণ্ডার হাতিয়ে নেওয়া, শত্রুদের ব্যাংক হিসাব হ্যাক করা, শত্রু-সাইটগুলোর তৎপরতা অকার্যকর করার মাধ্যমে তার সেবা থেকে বঞ্চিত করা এবং এ জাতীয় প্রযুক্তিগত আক্রমণগুলো। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদগণ এ ভাগে অনেক ধাপ অতিক্রম করেছেন, যা এ অঙ্গনে খাটো করে দেখার মত নয়। তবে, আপডেটেট প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরো বেশি চেষ্টা ও লাগাতার প্রস্তুতির মধ্যে থাকতে হবে। যেন এ অঙ্গনের সম্ভাব্য সকল সুযোগগুলো কাজে লাগানো যায়। বস্তুত বিষয়টি কঠিন নয়। শুধু উম্মাহর প্রতিভাবানদেরকে এই প্রতিশ্রুত ময়দানের ফল আহরণের জন্য জিহাদি কাফেলায় যুক্ত হতে হবে। আর জিহাদি জামাতকে ইলেক্ট্রনিক জিহাদের এ দিকটিকে আরো অধিক গুরুত্ব দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। এ স্থানে এর চেয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কল্যাণকে পূর্ণতা দান করুন!

৩। ধ্বংসকরণ সামর্থ্যগুলো:

এ বিভাগে এমন সাইবার আক্রমণগুলো অন্তর্ভুক্ত, যা প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ও ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধ্বংসের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন শাসন-কৌশল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকার্যকর করার মাধ্যমে উপকরণ ও জনবলের ক্ষতি সাধন করে। আর এটা হবে ওই সকল নেটওয়ার্কগুলো হ্যাক ও ধ্বংস করার মাধ্যমে, যা শিল্পভিত্তি এবং পানি ও বিদ্যুতের নেটওয়ার্কগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, জরুরী ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ধ্বংস করা সহ আরো বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। স্বভাবতই এ ধরণের কাজের জন্য বিরাট সামর্থ্য, নিবেদিত প্রাণ, বিশেষজ্ঞের বিশাল দল, দীর্ঘ সময় ও উন্নত মৌলিক ভিত্তির প্রয়োজন হবে। সাইবার আক্রমণের সামর্থ্য উন্নত করার জন্য কয়েক বছর ধারাবাহিক চেষ্টা করতে হবে। আর এটি সম্পন্ন করার জন্য একটি নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা ও উন্নত পরীক্ষা ক্ষেত্রের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এ সকল কঠিন স্তরগুলোই অতিক্রম করা সম্ভব, যদি ইচ্ছা ও সংকল্প থাকে। আর এর পূর্বে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল থাকে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদের জন্য পথ খুলে দিন এবং বিষয়টি সম্ভব করে দিন। বিষয়টি অত্যন্ত দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো উৎসাহ ও পথনির্দেশের জানালা উন্মুক্ত করা। বিশেষ করে উম্মাহর প্রতিভাবান শ্রেণী ও শিক্ষার্থী যুবকদের সামনে একথা তুলে ধরা যে, ইলেক্ট্রনিক জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ এবং ক্রুশের পতাকাবাহী আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বিশ্ব কুফরের মোকাবেলার সুযোগ আমাদের নাগালের ভিতরেই। এর জন্য

আমাদের প্রয়োজন শুধু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পর, সম্ভব হলে মুজাহিদগণের কাতারে যুক্ত হওয়া অথবা নিরাপদ হলে তাদের সাথে সমন্বয় করা। অথবা মুজাহিদগণের গাইডলাইন ও নীতিগুলো অনুসরণ করে এককভাবে কাজ করা।

আমরা সাধারণভাবে উম্মাহর সকল পুণ্যবান যুবকদেরকে এবং বিশেষ করে সে সকল মুসলিম যুবক ভাইদেরকে উৎসাহিত করছি, যারা বিভিন্ন বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে জিহাদি ময়দানের সাহায্য করতে পারছেন না; তারা যেন এ ময়দানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। কারণ এটি জিহাদের একটি বড় ক্ষেত্র। এমন একটি পথ, যা উম্মাহর সন্তানগণ উত্তমভাবে কাজে লাগালে এর মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরকে আরোগ্য লাভ করবে এবং কাফেরের দল ক্রোধান্বিত হবে। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও মুসলিমদের উপর সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুদের রসদ ও জনবলের ক্ষতি সাধন করা যাবে। এবং শত্রুর নিজ দেশেই তার সিস্টেমগুলোর উপর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালানো যাবে। তাই উম্মাহর সকলেরই, বিশেষভাবে যুবক ভাইদের উচিত, ইলেক্ট্রনিক ভিত্তি ও শক্তিগুলোকে চুরমার করে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব আদায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া। আধুনিক লড়াইয়ের ময়দানগুলোতে প্রবেশ করা। যেমন: শত্রু রাষ্ট্রগুলো ও তাগুতি রাষ্ট্রসমূহের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধ এবং তাদের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ইলেক্ট্রনিক নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া।

অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান উইলিয়াম ম্যাকুনেল বলে: যে ১৯ সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা বাস্তবায়ন করেছে, তারা যদি ইলেক্ট্রনিক অঙ্গনে দক্ষ হতো এবং একটি মাত্র ব্যাংককে হামলা করত, তাহলে অবশ্যই মার্কিন অর্থনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতির উপর তাদের অভিযানের ফলাফল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দু'টি টাওয়ার ধসিয়ে দেওয়ার তুলনায় আরো ব্যাপক হতো। উদাহরণ স্বরূপ-'ব্যাংক অব নিউইয়র্ক' ও সিটি ব্যাংক। এর প্রতিটি ব্যাংক দৈনিক প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলার আর্থিক লেনদেন করে থাকে। এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝার জন্য উল্লেখ করছি, আমেরিকার দেশীয় উৎপাদনের বার্ষিক সাধারণ পরিমাণ হচ্ছে ১৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এখন যদি এর ব্যাংক বিবরণগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ব্যাপক অর্থনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। মানুষ তাদের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না এবং কখন তাদের একাউন্টে যুক্ত হয়েছে কিংবা কখন তাদের আবশ্যকীয় কিস্তি পূরণের জন্য তা থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে, তা জানতে পারবে না। তাহলে আমরা কি এ ব্যবস্থাটি অকার্যকর হয়ে যাওয়ার অবস্থাটি কল্পনা করতে পারি? এখন তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদ নিছক কম্পিউটারে ইনপুট করা উপাদান হয়ে গেছে। আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রমগুলো স্বর্ণ ও মুদ্রার গ্যারান্টির বিকল্প হিসাবে ওই সকল ইনপুটগুলোর গ্যারান্টি ও তার উপর আস্থার ভিত্তিতেই চলছে।

ম্যাকুনেল এর সাথে আরো যোগ করে বলে: কয়েকজন ব্যক্তিই পারে আমেরিকান ও বিশ্ব অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে এবং ডলারের প্রতি আস্থা শেষ করে দিতে। তাই উম্মাহর যুবকদের উচিত এ ধরণের সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া, তা অনুধাবন করা ও চিন্তা করা। এবং নিজ মুসলিম জাতির জন্য জিহাদি আন্দোলনের কাঠামোকে উন্নত করার লক্ষ্যে শরীয়তে বৈধ এবং ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সকল উপায়ে কর্তব্য পালনের জন্য বেরিয়ে পড়া। আমেরিকা ও তার পশ্চাতে যত আন্তর্জাতিক মন্দ ও কুফরী শক্তি আছে তাদের ভরসা হলো ইন্টারনেটের উপর। আর ইন্টারনেটের সাথে সম্পর্কিত মাধ্যমসমূহের উপর ভরসাই একটি ভয়াবহ দুর্বলতার পয়েন্ট, যা কাজে লাগানো আবশ্যক। তথ্য নেটওয়ার্কগুলো হ্যাকিং ও জিহাদি অভিযানের সম্ভাবনার দিক থেকে যে পরিস্থিতিতে থাকে, তা ২০০১ সালের আগের আমেরিকান নিরাপত্তা পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন নয়, আল্লাহর তাওফিকের পর যে পরিস্থিতিই মূলত বরকতময় তিন হামলা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য জিম ল্যান গেফেরে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে নিবন্ধটি সমাপ্ত করছি: আমি এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করি, যেন ১১ সেপ্টেম্বরের পূর্বের অবস্থা। যেখানে আমরা সমস্যাটি জানতাম এবং হুমকি খুঁজে পেয়েছিলাম। আমরা জানতাম, এটা আছে এবং এটা বাস্তব। কিন্তু সমস্যার মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারিনি। **(শেষ)**

কার্টুন

বর্তমান যুগের এক মারাত্মক ব্যাধি

শাইখ হুসসাম আব্দুর রউফ রহিমাহুল্লাহ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বাধিক মর্যাদাশীল রাসূল, আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে অন্যতম হল নারীদের পূর্ণ দায়িত্ব এবং জবাবদিহিতার সাথে পরিবারের তত্ত্বাবধান করা থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলা। অথচ এটি আমাদের উপর আবশ্যক ছিল। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম নিজেদের সন্তানদের যেভাবে প্রতিপালন করে তার প্রতি লক্ষ্য করলেই এই স্বভাবের নেতিবাচক ফলাফল আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাদের কেউ কেউ সন্তানদেরকে নতুন নতুন কার্টুনের সিডি অথবা ভিডিও গেম এনে দেয়, আবার কেউ ইন্টারনেট থেকে সেগুলো ডাউনলোড করে দেয়। যেন তাদের সন্তানেরা এগুলো নিয়েই মেতে থাকে। মা-বাবাকে যেন তাদের সন্তানদের পিছনে সময় দিতে না হয়। মা-বাবা যেন আপন কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে। এটাই মূল সমস্যা।

শিশুরা তাদের চলাফেরা, খেলাধুলা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও অন্যদের সাথে উঠা-বসা সর্বক্ষেত্রেই কার্টুনের চরিত্রগুলোকে অনুকরণের চেষ্টা করতে থাকে। কখনো কখনো তো ঐ ফিল্মগুলোতে এমন বিষয়ও থাকে যা আক্বিদা- বিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে। শিশুরা এগুলোর সাথে সাথে নানা গর্হিত কাজে অভ্যস্ত হতে থাকে। যেমন অশ্লীল ভিডিও দেখা। আর ভিডিও গেইমগুলোর কারণে যে বিপর্যয় ও অবনতি ঘটে তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। জনপ্রিয় একটি ভিডিও গেইম হলো 'ব্লু হোয়েল') Blue Whale) যা এপর্যন্ত কত মুসলিম সন্তানের প্রাণ যে কেড়ে নিয়েছে তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এসমস্ত গেম শয়তানী চক্রান্তের অংশ, যার মাধ্যমে কাফির মুশরিকরা প্রচুর অর্থ লাভ করছে মুসলিমদের কাছ থেকে। অথচ এর ধ্বংসাত্মক ফলাফলের প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপই নেই। তার প্রমাণ হল, বিশ্বে প্রতি বছর এই গেইমগুলোর পেছনে প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়নের মত ডলার ব্যয় করা হয়।

যে শিশুটি কার্টুনের চরিত্র অনুকরণ করে দেখা যায়, সে এক সময় নিজেকে খুব সাহসী ভাবতে থাকে। অথচ বাস্তবে দেখা যায় এধরনের শিশুরা অনেক ক্ষেত্রে একদম ভীতু হয়ে থাকে এমনকি সামান্য তেলাপোকা দেখেও খুব ভয় পায়। এক সময় সে স্বাভাবিকতা বাদ দিয়ে কার্টুনের কৃত্রিম বেশ ধারণের চেষ্টা করে। অথচ এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট একটি বিষয়, প্রতারণা ও ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। আর কার্টুনের চরিত্রগুলোকে অনুকরণের কারণে সবচেয়ে মারাত্মক যে সমস্যাটা হয় তা হল, নিজেদের চলাফেরায় ও অঙ্গভঙ্গিতে কার্টুনের নায়কদের ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা। বাস্তবে একজন মানুষের পক্ষে যা করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। যেমন: শূন্যে উড়া, পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায় লাফ দিয়ে চলে যাওয়া, বিরাট উঁচু দেয়াল এক লাফে পাড় হওয়া, শুধু মাথা অথবা হাত ব্যবহার করে ইট কিংবা পাথরের কোন পিণ্ড ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি। ফলে শিশুরা তাদের অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে। যার শেষটা হয় বেদনাদায়ক বা রক্তাক্ত।

অন্যদিকে নিজের বীরত্ব যাহির করা হয় এমন বিষয়গুলো প্রধানত হিংস্রতা ও রক্তপাতমূলক কাজ। যা স্রেফ আত্মতৃপ্তি ও অতি উত্তেজনার বশে প্রতিশোধের জন্য করা হয়। আর ঠিক একই রকম প্রতারণা, উড়ে চলার বৈশিষ্ট্যটি পাখি নয় এমন কোনো মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত করা। এটা আল্লাহর চিরায়ত নীতির সুস্পষ্ট বিরোধিতা। আরও মারাত্মক যে সমস্যটি হয় তা হল, কর্কশ চেঁচামেচিতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, যা সকলের কানকে বিষিয়ে তুলে এবং আদব শিষ্টাচারের কমতির কারণে অন্যদের সাথে বিশেষ করে বড়দের সাথে উঁচু স্বরে কথা বলা।

যখন শিশুরা কার্টুন দেখার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তখন ধীরে ধীরে সে অলস হতে থাকে। কোনো কাজে ডাকা হলে সে সাড়া দিতে চায় না। কুরআন শরীফ হিফজ করা বা ইলমে শরীয়াহ অর্জন করার পরিবর্তে অহেতুক কাজে প্রচুর সময় নষ্ট করে, যা তার মেধা শক্তির উপর খুবই খারাপ প্রভাব ফেলে। অথচ এটা প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের বয়স।

আল্লাহ তায়ালা কারো জন্যই তার ভেতরে দু'টি অন্তর সৃষ্টি করেন নি। আর বিবেক দুটি দিকের কোনো একটিকে অবশ্যই গ্রহণ করে নেয়। হয় তা বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী, উপকারী জ্ঞান, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের আদর্শ, বিজয়ী সেনাপতিদের সদাচরণ

এবং বহু শাস্ত্রে পারদর্শী মুসলিম আলেমদের আখলাক, শিক্ষা ও আদব-শিষ্টাচার গ্রহণ করে। আর না হয় ভাসাভাসা জ্ঞান, আমাদের আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত স্থুল চিন্তা-চেতনা এবং বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী গ্রহণ করে নেয় যা তৈরী হয় নিকৃষ্ট পন্থায় হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক শৈলীতে। এছাড়াও শিশুরা কার্টুনের নায়কদের থেকে যা শোনে সেটা তোতা পাখির মত আওড়াতে থাকে, যদিও তাতে প্রতারণামূলক বা বেয়াদবিমূলক কোনো কথা থাকে, বা এমন কথা, যাতে লজ্জা শরমের কোন বালাই থাকে না। অথচ সে এগুলোর কিছুই না বুঝে কার্টুনে যেসব অঙ্গভঙ্গি ও মারামারি দেখে সেগুলো তাঁর সাথীদের সাথে অভিনয় করে থাকে। একসময় তাদের মাথায়, বুকে, কিংবা শরীরের স্পর্শকাতর কোন জায়গায় আঘাত লাগে যা মারাত্মক ধরণের ক্ষতির কারণ হয়। এমনকি কখনো কখনো মৃত্যুরও কারণ হয়; আল্লাহই সাহায্য প্রার্থনার একমাত্র স্থল। কার্টুন আসক্ত শিশুদের মধ্যে আখলাক বলতে কিছু থাকে না। যেমন: বড়কে শ্রদ্ধা করা, ছোট ও দুর্বলকে ভালোবাসা, চলার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা, উলামায়ে কেরাম, মুরুব্বি, ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মজলিসে চুপচাপ থাকা, কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে আদব রক্ষা করা, কোনো কিছু জানার জন্য আদবের সাথে প্রশ্ন করা, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মাহরাম বা গায়রে মাহরামদের ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাওয়া, সৌজন্যবোধ, অন্যের বিশেষ কোন গুণ বা যোগ্যতাকে সম্মান করা, এবং কারও গোপন বিষয়ে অনুসন্ধান বা ধারণা না করা...এমন আরও বিভিন্ন আদব!

উল্টো সে এগুলোর বিপরীত স্বভাবগুলোকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয়, যা সে ঐ কার্টুনগুলো থেকে শেখে। যেমনঃ কোন কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় না রাখা, অপরাধ করে অস্বীকার করা, অথবা পিতা মাতা অপারগ হওয়া সত্ত্বেও আবদার পূরণে বাধ্য করা; বিশেষত তাকে পিতামাতার ব্যাপারে এমনটা শিখানো হয়েছে যে, পিতামাতা সন্তানের অন্যায় আবাদরও পূরণ করতে বাধ্য। এভাবেই সে ধীরে ধীরে বাবার পকেট থেকে, মায়ের ব্যাগ থেকে এবং অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে চুরি করার দিকে ধাবিত হতে থাকে।

এই প্রবন্ধে যা কিছু বলা হল এখানে আমরা এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। তবে সকল পিতামাতার প্রতি আমাদের অনুরোধ আপনারা দয়া করে শিশুদের চিন্তা-চেতনা ও আচার-ব্যবহারে কার্টুনগুলোর খারাপ প্রভাবের ব্যাপারে মনোবিশেষজ্ঞ, সমাজবিশেষজ্ঞ এবং সন্তানের লালন পালনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষকদের পরামর্শ জেনে নিবেন।

এপর্যায়ে এই ধ্বংসাত্মক ফেতনার ব্যাপারে বিশিষ্ট কিছু আলেমের মতামত ও তাঁদেরকে করা কিছু প্রশ্নের জবাব তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সন্তানদের রক্ষা করুন ঐ সমস্ত লোকের কবল থেকে, যারা যুক্তি বহির্ভূত বিষয়ে তাদের মন-মানসিকতাকে সংসয়গ্রস্থ করে দেয় এবং যারা তাদের চিন্তা-বুদ্ধিকে সর্বদা পেরেসান ও অস্থির করে রাখে। বিশেষত শিশুরা যখন দেখে যে, তারা কার্টুনগুলোতে যা দেখছে আর বাস্তবে যা হয় তা এক নয়। তারা যা দেখে তা একরকম আর উলামায়ে কেরাম ও পিতামাতার কাছ থেকে যা শুনে তা আরেকরকম। ফলে এটা তাদের আক্বীদার মূলভিত্তিকেই নষ্ট করে দেয়।

এবিষয়ে একজন আলেম বলেনঃ শিশুরা কার্টুন দেখুক এমন পরামর্শ আমি কোনোভাবেই দিতে পারি না। কারণ, শিশুটি যখন কার্টুন দেখতে থাকে তখন সেটার প্রতি তার একটা বিশ্বাস জন্মে যায় এবং সে সেটাকে সত্য মনে করতে থাকে। ফলে সে যখন বড় হয় এবং দেখে আসলে এটা সঠিক নয় তখন তার মনে একটা ধাক্কা লাগে। এতদিনের জেনে আসা বিষয়গুলো তার মাথার ভিতরে একটা ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে। আর সে কার্টুনের মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠতে থাকে। একসময় সে নিজেকে কার্টুন ভাবতে শুরু করে এবং কার্টুনের মত আচরণ করে। এজন্য তাকে শাসন করলেও সে তা মানতে চায় না। অতএব, সে মানসিকতার দিক থেকে সেই ছোট্ট কার্টুনই রয়ে যায়। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত সে কার্টুনের চিন্তা-চেতনা নিয়েই কাটিয়ে দেয়।

আরেকজন আলেম বলেন, 'অনেক সময়ই আমরা শিশুদের লালনপালনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেই না। অথচ এটা স্বতন্ত্র একটি বিষয়। যার বহু শাখা ও মূলনীতি আছে। এবিষয়ে বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে।

শিশুদের মন-মানসিকতা এবং বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমদের লিখিত অনেক বই রয়েছে। এবিষয়ে কিছু বলা তো এমনিতেই খুব গুরুত্ব বহন করে।

এটা কখনোই ঠিক হবে না যে, কোনো মুসলিম শিশুর মাথায় শুধু কিছু কার্টুন, রূঢ়তা, ও উগ্রতায় ভরা থাকবে। কারণ, এমন অনেক মৌলিক জ্ঞান রয়েছে যা শিশুদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব, যদি সেগুলো সুন্দরভাবে উপযুক্ত পন্থায় তাদের সামনে উপস্থাপন করা যায়। আমাদের উচিৎ সুন্দর সুন্দর শিশুতোষ গল্পগুলো পড়ে নেয়া। তারপর আপনি যখন আপনার ছেলে, ভাই অথবা অন্য শিশুদেরকে কোনো ঘটনা বলবেন হোক সেটা মসজিদে বা গল্পের আসরে তখন তাদেরকে গঠনমূলক ও অর্থবহ ঘটনা বলবেন, এবং যেভাবে তাদের উপযুক্ত সেভাবেই বলবেন। কেননা শিশুদের মেধা আমরা যতটুকু ভাবি আসলে তারচেয়েও অনেক বেশি। আমরা তাদেরকে যতটুকু দেই তারচেয়েও বহুগুণ বেশি আয়ত্ব করার ক্ষমতা তারা রাখে। সুন্দর সুন্দর ঘটনা সম্বলিত বই পাঠ করে আমরা শিশুদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারি। আমরা যদি এমন কোনো প্রজন্ম তৈরী করে যেতে পারি যারা ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে ভালোবাসে তাহলে অবশ্যই উম্মতের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং খুব দ্রুতই এটা হবে’।

‘অনেক সময়ই আমরা শিশুদের লালন-পালনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেই না। অথচ এটা স্বতন্ত্র একটি বিষয়। যার বহু শাখা ও মূলনীতি আছে। এবিষয়ে বহু গ্রন্থও রচিত হয়েছে,

অপর একজন আলেম এসবের সাথে যোগ করে বলেন, ‘শোনো আল্লাহর বান্দারা, এরপরও দু’একটি সমস্যা রয়ে যায়। একটি হল সন্তানের অধিক কথা বলায় বা বেশি বেশি প্রশ্ন করায় কতক পিতা দুঃখ প্রকাশ করে। তা দূর করার জন্য ভাল-মন্দ যেকোন উপায় খুঁজতে থাকে। মনে রাখবে, শিশুদের অধিক কথা বলা ও বেশি বেশি প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক বা দুশ্চিন্তার কোনো বিষয় নয় বরং এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমটাই তো তার মনোযোগ আকর্ষণ করার এবং তাকে শিক্ষা দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ। কতক পিতা আছে, তারা এই বাহ্যিক ব্যাপার নিয়ে যখন হাহুতাশ করতে থাকে, সন্তানের বেড়ে উঠার একটা পর্যায়ে তারা বাজার থেকে কীবোর্ড মনিটর নিয়ে আসে। সেইসাথে শিশুটির জন্য ৫০-৬০ পর্বের কার্টুন সিরিজ বা ফিল্ম নিয়ে আসে। এরপর কাজের মহিলাকে বলে যায়, ও যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন তাকে এই প্রোগ্রামটা চালু করে দিয়ো, আর এটা শেষ হলে ঐটা দিও। অবস্থা যখন এই তখন এই শিশুটিকে কে আদব- আখলাক শিক্ষা দিচ্ছে? নিশ্চয় ঐ প্রোগ্রামগুলো। কে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখছে? নিশ্চয় ঐ ভিডিও ফিল্মগুলো। সবকিছু তাকে কে শিখাচ্ছে? ঐ চলচিত্রগুলোই তাকে সবকিছু শিখাচ্ছে। শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এটা একটি বড় ভুল, যা অনেক বাবারাই তাদের সন্তানের সাথে করে থাকে। ফলে সন্তান যখন পড়াশোনার বয়সে উপনীত হয় তখন পিতা সন্তানের ভেতর দেখতে পায় পড়াশোনার প্রতি অনীহা। ভাবভঙ্গি ও স্টাইলের প্রতি খুব আগ্রহ দেখা যায়, মন যা চায় তা করতেই তার ভাল লাগে ও শিক্ষা গ্রহণের প্রতি তার তেমন ইচ্ছা নেই। তখন তার পিতা বলতে থাকে; এই ছেলেটা একটা ব্যর্থ ছেলে বা দুর্বল ছেলে। এছাড়া আরও কত কি! অথচ দুর্বল আসলে তাঁর পিতাই। তাঁর পিতাই তো সেই হতভাগা যে নিজ সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব ঐ কার্টুনগুলোকে অর্পণ করেছেন। আমি অনেক বাবাকেই বলেছি, তারা যেন এই মাধ্যমগুলোকে তাদের সন্তানদের থেকে দূরে রাখে। আল্লাহর শপথ করে বলছি , নিশ্চয়ই তা একটি ধ্বংসাত্মক, প্রাণনাশী ও প্রাণঘাতী মাধ্যম। এটা ধীরে ধীরে গড়ে তোলা আক্বীদা বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয় এবং শেখানো শিষ্টাচারকে নষ্ট করে দেয়।

একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই আসে- শিশুরা যদি এই কার্টুন ফিল্মগুলো দেখে একটু আনন্দ পায় তাহলে সেটা কী আমাদের জন্য গোনাহের কিছু হবে?

উত্তরঃ আমার জানা মতে – কার্টুনের মুভিগুলোতে আক্বীদা বিধ্বংসী ও চরিত্র বিনষ্টকারী অনেক বিষয় রয়েছে। এবং এগুলো শিশুকে অন্যায় ও অপরাধপ্রবণ করে গড়ে তুলে। সুতরাং এগুলো এর ভেতরে থাকা মারাত্মক ক্ষতি ও গুরুতর অনিষ্টের কারণে নিষিদ্ধ। বাকি আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন: খুব মারাত্মক ধরনের ক্ষতি কী কোনো কার্টুন মুভিতে নেই?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে, এইতো কিছুদিন আগের একটি ঘটনার কথাই ধরা যাক, আমি এক ভাইয়ের সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলাম। তখন একটি কার্টুনে দেখলাম, দুই তরুণ-তরুণী পরস্পর কথা বলছে। তরুণীটি তরুণের জন্য একটি উপহার নিয়ে তার বাসাতে অসুস্থ তরুণকে দেখতে এসেছে। আর ছেলেটিও তাকে অভ্যর্থনা জানালো এই বলে যে, 'আরে আসো আসো, ভেতরে আসো'। আর সেও তার সাথে কামরায় চলে গেল, সঙ্গে ছিল শুধু তার পোষা বিড়ালটা! ঘরটা এলোমেলো ছিল। তাই তরুণীটি তরুণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সব গুছিয়ে দিল। তারপর তারা দু'জন মিলে শেষ পর্যন্ত গল্প করতে থাকল। এরপর অন্য একটি দৃশ্য আসলো, সেটাতে দেখানো হচ্ছে, মেয়েটার দুই বান্ধবী তাদের বিষয়টি নিয়ে আপত্তি করছে। একজন আরেকজনকে বলছে; জানিস, অমুক মেয়েটা অমুক ছেলের বাসায় গিয়েছে। তখন পাশের জন উত্তর দিল, নাহ এটা অবিশ্বাস্য।

অথচ এই মেয়ে দুইটি দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, তরুণীটি আসলেই সেই তরুণের বাসায় গিয়েছে। তারা দেখল, ওরা দু'জন ঘরের ভেতরে একসাথেই আছে। তখন একজন অপরজনকে বলে, নাহ্ ওর মতো মেয়ে কোনো ছেলের ঘরে একা ঢুকবে, আর তার সাথে কেউ থাকবে না এটা অসম্ভব। এটা শুনে অন্যজন হেসে হেসে বলে, হ্যাঁ, ঠিকই তো আছে, ওর সাথে তো একজন আছেই। সেটা হচ্ছে ওদের পোষা বিড়ালটা। এখানেই মূলত শিশুদের শেখার জায়গা। এখানে তো আমাদের শিশুদের প্রায়োগিকভাবে অনুশীলন করানো হচ্ছে। তারা শিখছে, ছেলেদের ও মেয়েদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয় এবং এটা ছোটদের জন্য স্বাভাবিক বিষয়, এতে বড়দের আপত্তি করার কিছু নেই। তারা আরও শিখছে যে, একজন তরুণের জন্য তার বন্ধবীকে নিজ ঘরে আমন্ত্রণ জানানো এবং সেও তার ডাকে সাড়া দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে এখান থেকে আরও বুঝে নিচ্ছে যে, নারী-পুরুষের একান্তে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হওয়ার জন্য ছোট বিড়ালই যথেষ্ট!

বাহ্ কী চমৎকার! এটা তো দেখি নব আবিস্কৃত ফর্মূলা, যা আমরা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কারও কাছ থেকেই শুনি নি। আমরা তো শুধু এটা জানলাম যে, ছোট একটা বিড়ালের উপস্থিতিই তরুণ তরুণীকে একান্তে দেখা করাকে বৈধ করে দেয়। বর্তমানের কার্টুনগুলো এমন যা কচি হৃদয়ে জাদুবিদ্যা ও জাদুকরের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপন করে দেয়। এবং এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয় যে, জাদুকররা ভালো মানুষ, তারা ভালো মানুষদের উপকার করে, তারা কখনো খারাপ প্রকৃতির হয় না। অথচ জাদু হল স্পষ্ট কুফুরী'।

অপর একজন আলেম এর সাথে যুক্ত করে আরও বলেন, 'একবার আমি রেডিওর চ্যানেল ঘুরাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা চ্যানেলে এসে থামলো, যেখানে ছোটদের জন্য গল্প অনুষ্ঠান চলছিল। রেডিও উপস্থাপক বলছিল পিপীলিকা খুবই পরিশ্রমী ও খাদ্য সংগ্রহ করে নিজ গর্তে জমা করে রাখে। আর বিপরীতে তেলাপোকা খুবই অলস প্রাণী। তেলাপোকা খাদ্য জমা করবে তো পরে, বরং জমানো খাবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ওলট পালট করে ফেলে রাখে। নিজের বিষয়ে থাকে একেবারেই বে-খেয়াল। এভাবে শীতকাল চলে আসলো। পিপীলিকার তখন মহা আনন্দ, আর তেলাপোকা ক্ষুধার তাড়নায় ছুটোছুটি শুরু করলো। একপর্যায়ে প্রতিবেশী পিপীলিকার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালো এবং বলল, "ভাই পিপীলিকা! তুমি আমাকে কিছু দানা ঋণ দাও, আগামী বছর আমি তোমাকে দিয়ে দিবো। সঙ্গে সাধারণ লভ্যাংশ সহ দিব"।

চিন্তা করে দেখুন, কার্টুনে বলা হচ্ছে তেলাপোকা পিপীলিকার কাছ থেকে ঋণ নিবে পরের বছর অতিরিক্ত লাভসহ অর্থাৎ সুদসহ ফেরত দিবে।

এই শিশুটি যখন কচি বয়সে এই প্রোগ্রামগুলো শুনছে তাখন তার কচি হৃদয়ে কী ঢুকছে? আমরা সন্তানের চরিত্র বিগড়ানো দেখে বিস্ময়বোধ করি, বলি ভুলটা কোথায়? এই সমস্যার মূলটা কোথায়? আরে, সমস্যার মূল তো এই শিশুরা যা দেখছে এবং শুনছে। এই কার্টুনগুলোই মূল সমস্যা। এখানে দেখানো হচ্ছে, তেলাপোকা পিঁপড়ার কাছ থেকে অতিরিক্ত লভ্যাংশ অর্থাৎ সুদ দেয়ার শর্তে ঋণ গ্রহণ করছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, এভাবে আমাদের শিশুদের কোন পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! সুতরাং তাদের বানানো এই কার্টুনগুলোর মাঝে থাকা নেতিবাচক জিনিসগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিৎ। যা আগ্রাসী খ্রিস্টবাদী ভাষা থেকে আরবীতে রূপান্তরিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। আর বিপরীত লিঙ্গের সাথে সখ্যতা গড়ার প্রতি উৎসাহ, অবাধ বিনোদনে বের হওয়া, নাচ-গানের প্রশিক্ষণ এসবই এসমস্ত কার্টুনে বিদ্যমান। এছাড়াও আমরা আরো যা শুনেছি তা তো রীতিমত শিওরে উঠার মত। তারা শিশুদেরকে শিখায় যে, আপত্তিজনক বিষয়গুলো আসলে প্রকৃতিগত। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা স্বাভাবিক বিষয়!!! এমনকি পর পুরুষ বা পর নারীর সাথে সম্পর্ক গড়াটাও খুবই সাধারণ একটা বিষয়। এগুলোই এখনকার কার্টুনের মাধ্যমে শিখানো হচ্ছে।

প্রশ্নঃ তাহলে কি টিভিতে যে সকল কার্টুন দেখানো হয়, যেগুলোর শুরু হয়, 'জীবন তো একটাই' এই ধরণের কথা দ্বারা সেগুলোর ব্যাপারে পিতামাতা ও অভিভাবকদের সচেতন করা দরকার বলে মনে করেন কি? এটা কি আমরা আপনাদের কাছে আশা করতে পারি? অভিভাবকগণ তো দাবি করে থাকেন যে, তারা এসমস্ত উপকরণ থেকে বাসাবাড়ি খালি রাখতে অপারগ। অথচ আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিজেদেরকে ও পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করতে বলেছেন।

উত্তরঃ কার্টুন ভিডিওগুলোতে যদি এধরনের কথা থাকে যে, জীবন তো একটাই... ইত্যাদি তাহলে এর অর্থ হল, তারা কৌশলে মুসলিম শিশুদেরকে এই পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, এই উম্মাহকে সৃষ্টি করার কারণ কী এবং এই জগৎ কেনো তৈরি করা হল এসব বিষয়ে সংশয়গ্রস্ত করে তুলছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। এবং আমরা ধীরে ধীরে পরকালের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমাদের সামনে এই জীবন ছাড়াও আরেকটা জীবন আছে। তো মুসলিমদের ঘরবাড়িতে যদি এসব পাওয়া যায় এবং মুসলিম শিশুদের সামনে যদি এগুলো উপস্থাপন করা হয় তাহলে তো বিষয়টা খুবই মারাত্মক। আল্লাহ আমাদের নিরাপদ রাখুন।

বর্তমানে কিছু মডারেট মুসলিম যে সকল আক্বীদাহ পোষণ করে এবং বিভিন্ন সাময়িকী, কার্টুন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রচার করে, তার একটি হল- জাদুকর, জ্যোতিষী, গণক বা যে কারও পক্ষেই নিষ্প্রাণ কোনো জিনিসকে প্রাণ দেয়া সম্ভব। এটা তাওহীদে রুবুবিইয়্যাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলোর প্রতিটিই আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরকের নামান্তর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রুবুবিয়্যাহ এর সাথে শিরক এটাও হবে, যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, গায়েবের বিষয় জানা, যে কোনো বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেয়া বা মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষেও সম্ভব। আল্লাহর হুকুম ছাড়াও এটা করা সম্ভব। ইসলামী রীতিনীতির দিকে সঠিক দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে পরিবারের ভেতর একটি শিক্ষামূলক কার্যপ্রণালী থাকতে পারে, যাতে শিশুরা অর্থহীন কাজকর্ম যেমনঃ কার্টুন, কম্পিউটার গেম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে।

এটা অবশ্যই খুশির সংবাদ হবে, যদি পরিবারের কোনো যুবক ভাই বা মুরুব্বী পর্যায়ের কেউ আল্লাহ তায়ালার কাছে পুরস্কার লাভের আশায় সপ্তাহে এক থেকে দেড় ঘণ্টার জন্য ঘরের শিশুদেরকে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনায় বসেন। এবং তাদের জন্য একটি সুন্দর রুটিন তৈরি করে দেন, যার ভেতর থাকবে কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা বা উপদেশমূলক কর্মসূচি, অথবা খেলাধুলা বা প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি। আর এগুলোর পাশাপাশি তাদেরকে সঠিক আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়ে দেন। কারণ, আমাদের সন্তানদের থেকে দিন দিন অনেক ইসলামী আদব হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এটা অনেক বড় একটা ফল দিবে বলে আশা রাখি।

আর এগুলোর সবই কোরআনের সেই আয়াতেরই আমল হবে যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।” [সুরা আত-তাহরীম ৬৬;৬]

এভাবে এক পর্যায়ে যখন সন্তানটি আল্লাহর পথের দাঈ এ রূপান্তরিত হবে, অবিচলতার পথ ধরবে, ইসলামকে নিজের সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে নিবে, সঠিক পথে পরিচালিত হবে এবং দাওয়াত ও ইলমের পথে অগ্রসর হওয়া শুরু করবে, তখনই সে সকল বিষয়ে প্রশান্তি লাভ করবে। এগুলোর সঠিক উৎস পেতে শুরু করবে। এবং আনুগত্য ও হেদায়েতের পথে মজবুত ও সুদৃঢ় অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হবে। বাড়িতে হারাম জিনিসগুলোর কিছু থাকা, যেমনঃ বিনোদনের বিভিন্ন উপায় ও উপকরণ - এগুলোও বাড়িতে থাকা আশঙ্কার অন্তর্ভুক্ত। বিনোদনের হারাম উপকরণ, এবং যে মাধ্যমগুলোতে হারাম জিনিস দেখা হয়, পড়া হয়, বা শোনা হয় এসবগুলোর মাধ্যমেই প্রচার করা হয় তথাকথিত মুক্তচিন্তা, প্রকাশ্য ধর্মদ্রোহীতা, এবং ধার্মিক লোকদের প্রতি অবজ্ঞা। এগুলো নিয়ে বিভিন্ন নাটক পরিবেশন করা হয়। এমনকি আক্বীদাহ বিনষ্টকারী এসব ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে কার্টুন ফিল্মগুলোও মুক্ত নয়।

শেষ করব ইমাম মুহাম্মদ বশির আল ইবরাহীমী রহিমাহুল্লার একটি উক্তি দিয়ে। তিনি বলেন,

‘একজন ব্যক্তির জন্য সর্বনিকৃষ্ট অবস্থা হল কাজ না করে শুধু কথা বলা। আর এরচেয়েও নীচ অবস্থা হল খড়কুটার মত হওয়া, মানুষের সাথে কল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা ও মনস্তাত্ত্বিক এই যুদ্ধে সঠিক কোনো মত পেশ করার পরিবর্তে লোকে যা বলে এবং করে সেটাই বলে বেড়ানো’।

হে আল্লাহ, আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি এবং আপনার প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আমরা আপনার নিকট ভুলভ্রান্তি হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট তওবা করছি। আর আপনি আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

“রাজনীতি এবং চরিত্র গঠনে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) মুজাহিদদের জন্য অনুকরণীয়”

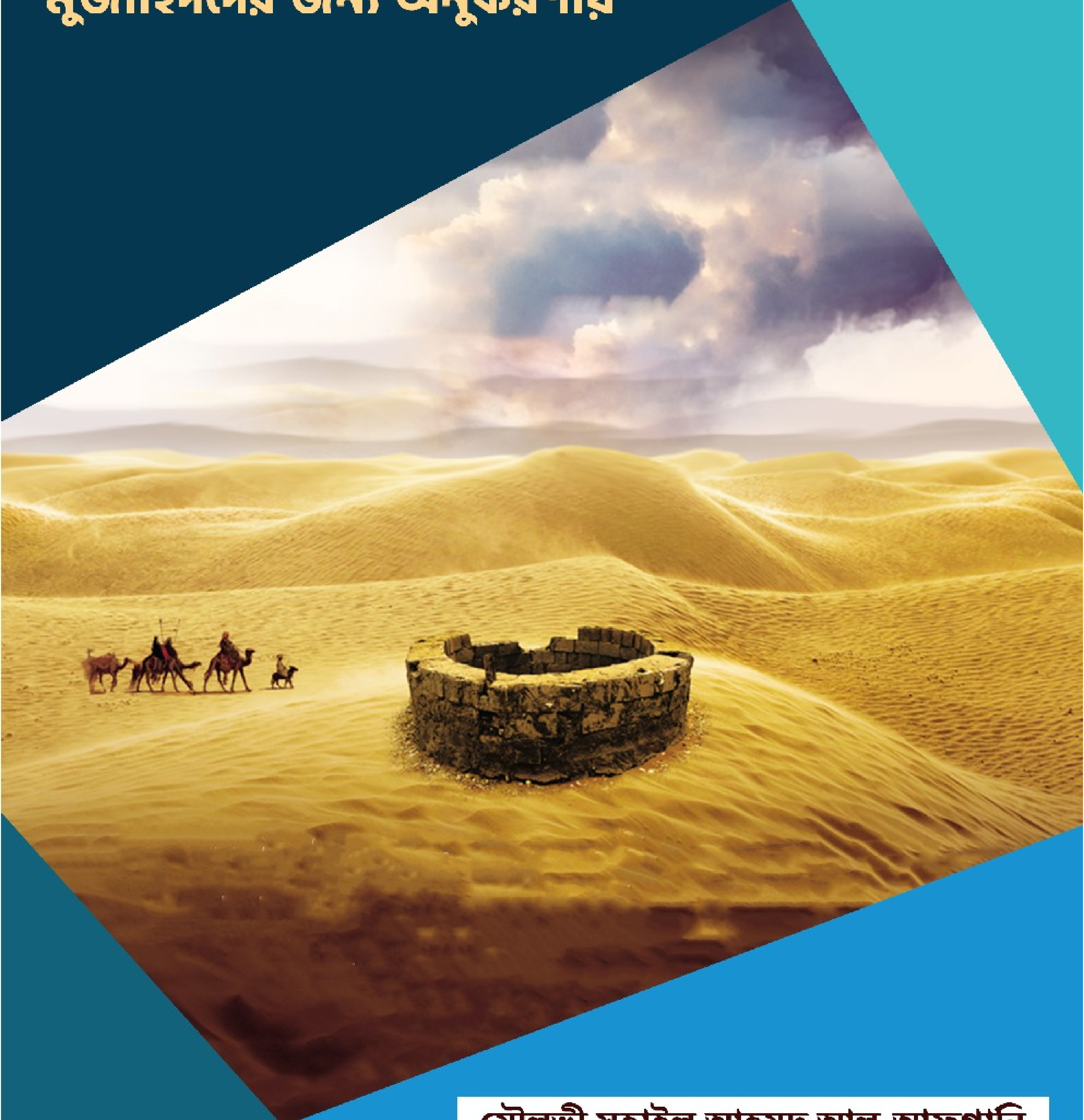

মৌলভী সুহাইল আহমদ আল-আফগানি

দুনিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত ধরণের প্রশংসা করা হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতে হবে এবং যতটুকু প্রশংসা হওয়া সম্ভব সবই আল্লাহর জন্য। দরুদ এবং সালাম প্রেরণ করছি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবিদের উপর।

দরুদ এবং সালামের পর...
দ্রুত আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নিজেকে কুরআনের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। আর এটাই হলো আল্লাহ তায়ালার কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য।

মুজাহিদদের চলার জন্য কুরআনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। পাশাপাশি জিহাদি আমিরগণও কুরআনের অনেক ব্যাখ্যা করে থাকেন। আমাদের উচিৎ হলো সেগুলোকে অনুসরণ করা। যাতে করে আমরা নিজেকে মুত্তাকী হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি সমসাময়িক জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এ কুরআন সকলের জন্য জানা জরুরি। বিশেষ করে যারা কুরআনের অজানা হিকমত সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, যারা ফালতু জাতীয়তাবাদের মোহে পড়ে আছে, যারা মুসলিম সভ্যতার ঐতিহ্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী তাদের সকলের জন্য জানা জরুরি। কারণ দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য কুরআন হলো সবচেয়ে উপকারী কিতাব।

বিশেষ করে আমরা মুজাহিদরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব, মুজাহিদদের জন্য কালামুল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিতাব মুজাহিদদের ইলমি চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে না। সুতরাং, আমাদের নিজেদেরকে কুরআন দ্বারাই গঠন করতে হবে এবং প্রস্তুত করতে হবে। যারা নিজেদেরকে সুসংগঠিত করে শান্তি পেতে চায় তাদের জন্য সুচারু এক কিতাব এই কুরআন। আর যারা সঠিক গন্তব্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চায় তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। যে ব্যক্তিগত কাঠামোকে সুন্দর করতে চায় তার জন্য আয়না। যে দুনিয়ায় ও আখিরাত উভয় জগতের সফলতা চায় তার জন্য এ কিতাব একজন উপদেশদাতার মত। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহকে বাড়িয়ে দেন। তিনি যেন তাঁর বান্দাদেরকে উপকারী ইলম, সৎকাজ, দ্বীনের জ্ঞান এবং তাঁর কিতাবের সঠিক বুঝ দান করেন। কারণ তিনিই হলেন উত্তম অভিভাবক এবং সর্বশক্তিমান।

শুরুতে বাস্তব একটি সত্য কথা বলা দরকার, মুজাহিদদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যিনি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা সম্পর্কে জানেন না। অধিকাংশ লোকের কাছে স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা ইউসুফ(আলাইহিস সালাম) এর ধারাবাহিক কাহিনী, কাহিনীর পরিণতি কী হয়েছিল এবং এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী:

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে লালিত-পালিত হন। কিছুদিন পর গোলাম হিসাবে মিশরে বিক্রি হন। এরপর কিছু দিনের জন্য কারাগারে বন্দি হন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। অবশেষে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মিশরের বাদশাহকে শক্তিশালী করেন। এরপর মিশরের ভূমিতে তিনি মারা যান। কিন্তু শতাব্দী খানেক পরে হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) এসে তাঁকে কবর থেকে তুলে নিয়ে, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নিজ জন্মভূমি ফিলিস্তিনে নিয়ে যান।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম এবং দাফন উভয়টি ফিলিস্তিনে হয়েছে। কিন্তু তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় মিশরে কাটান। এক পর্যায়ে বন্দি হন। এরপর মুক্তি পেয়ে মিশরের বাদশাহের দরবারে যান। এরপর মিশরে মারা যান। কিন্তু তাঁর লাশকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এরপর তাঁর জন্মভূমি ফিলিস্তিনে দাফন করা হয়। এটাই হলো হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর অতি সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী।

ওয়াদা পূরণ:

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর মনিবের স্ত্রী জুলায়খা তাঁকে জিনা করার দিকে আহ্বান করলে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

قَلَ مَعَاذَ اللهِ اِنَّهُ رَبِّيۤ اَحۡسَنَ مَثۡوَايَ اِنَّهُ لَا يُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ

"আল্লাহ রক্ষা করুন, তিনি (তোমার স্বামী) আমার মুরব্বি, আমাকে কত উত্তমভাবে রেখেছেন; এমন অকৃতজ্ঞরা সফল হয় না"। [সূরা ইউসুফ, ১২:২৩]

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এমন কাজ করার পেছনে দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, আল্লাহর ভয়ে অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, তার মনিবের সাথে খিয়ানত না করা। কারণ মনিব তাঁকে যেহেতু থাকার ব্যবস্থা করেছেন, সম্মানের সাথে রেখেছেন, তাই তাঁর সাথে সদাচরণ করতে হবে। আর মুজাহিদদের জন্য সদাচরণ করা অপরিহার্য গুণ। বিশেষ করে মুজাহিদ আমিরদের জন্য। সুতরাং, যে আমাদের প্রতি দয়া করবে আমাদের জন্যও তাদের প্রতি দয়া করা জরুরি হবে। দয়া বা ক্ষমা যার মাধ্যমেই হোক না কেনো। কিন্তু দয়ার মধ্যে কোনো সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। সুতরাং, মুজাহিদদের জন্য জরুরি, উত্তমভাবে নিজেকে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর মতো হবার জন্য প্রস্তুত করা। কারণ তারা কোন সাধারণ লোক না। এরকম দুর্লভ চরিত্রের অধিকারী লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর, আল্লাহ যার উপর রহম করেন সে ছাড়া। আল্লাহর কাছে দুয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে এরকম উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানান। আমিন।

হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ভাইদেরকে ক্ষমার মাধ্যমে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বলেন,

لَا تَثۡرِيۡبَ عَلَيۡكُمُ الۡيَوۡمَ،يَغۡفِرُ اللهُ لَكُمۡ وَهُوَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِيۡنَ

"আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি মাফ করবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। [সূরা ইউসুফ, ১২: ৯২]

তিনি ক্ষমা করে বলেন,

لَا تَثۡرِيۡبَ

"কোনো ক্ষোভ নেই"।

আর তিনি ভাইদের অনুভূতিতেও কোনো আঘাত করেননি।

তিনি বলেন,

مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ الشَّيۡطٰنُ

"শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর"। [সূরা ইউসুফ, ১২ :১০০]

এ কথা বলা স্বাভাবিক ছিল যে,

من بعد ان تسلط على اخواني

"আমার উপর ভাইয়েরা মুসিবত চাপিয়ে দেওয়ার পর"।

কিন্তু তিনি দোষ ভাইদের দিকে না দিয়ে বরং শয়তানের দিকে দিয়েছেন। তিনি বললেন,

مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ الشَّيۡطٰنُ بَيۡنِيۡ وَ بَيۡنَ اِخۡوَتِيۡ

"শয়তান আমার ও ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর"।

বিভেদের কারণ হিসাবে শয়তানকেই দায়ী করেছেন। আল্লাহর কসম! এটিই হলো উত্তম আখলাকের নমুনা। এ বিষয়ে "মুতানাব্বি" খুব সুন্দর কথা বলেছেন,

و ما قتل الاحرار كالعفو عنهم—و من لك بالحر الذي يحفظ اليدا.

اذا انت اكرمت الكريم ملكته—و ان انت اكرمت اللئيم تمردا.

"ভদ্র ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার থেকে ক্ষমা করাই ভাল (কেননা তাদের জন্য ক্ষমা করা মানেই হত্যা করা)। আর ভদ্র ব্যক্তি হলো যে অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখে। যখন তুমি ভদ্র ব্যক্তিকে সম্মান করবে তখন তুমি তার মালিক হয়ে যাবে। আর অভদ্রকে সম্মান করলে সে তোমার অবাধ্য হয়ে যাবে"।

প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য চরিত্র উন্নত করার দ্বারা তাকওয়া অর্জন করা:

প্রত্যেক নেককার এবং নবীদের জন্য উত্তম চরিত্র এক অপরিহার্য গুণ। বিশেষ করে আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে জিহাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাদের জন্য আরো বেশি চারিত্রিক উন্নতকরণ দরকার। সাহাবায়ে কেরামদের আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একমাত্র কারণ, তাঁদের চরিত্র অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

মানুষের এসলাহের ব্যাপারে মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য এবং নববী আখলাক যাতে করে নিজের মধ্যে চলে আসে সে জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করা দরকার। তিরমিযী শরীফে আছে,

خصلتان لا تجتمعان في المنافق حسن سمت و لا فقه في الدين

"দুটি জিনিস মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হয় না এক. উত্তম আখলাক দুই. ফিকাহ ফি দ্বীন"।

উত্তম চরিত্র দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধুমাত্র বাহ্যিক আমল ভাল হওয়া। উত্তম আখলাকের আসল উদ্দেশ্য হলো - তাকওয়া অর্জন করা, কলঙ্ক মুক্ত হওয়া এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এই উত্তম চরিত্রকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় করে নিয়েছেন। তাঁর এই চরিত্রকে কারাগারের বন্দিত্ব এবং মিশরের বাদশাও কলুষিত করতে পারেনি। এই উত্তম চরিত্র এবং তাকওয়া ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর চেহারাকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল। তিনি কারাবন্দি থাকা অবস্থায় আল্লাহ বলেন,

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ،قَلَ اَحَدُهُمَا اِنِّیْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا،وَ قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ،نَبِّئْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ،اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ.

"আর ইউসুফের সাথে (বাদশাহর) আরো দু'জন দাস কারাগারে ঢুকল। তাদের একজন বলল, আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখছি যে, আমি আঙ্গুর নিংড়ে তার রস বের করছি এবং অপরজন বলল, আমি নিজেকে এমন অবস্থায় দেখি যে, রুটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি, আর তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন, আপনাকে আমাদের নিকট সৎকর্মপরায়ণ বলে মনে হচ্ছে"। [সূরা ইউসুফ, ১২:৩৬]

অন্য একটি আয়াতে এসেছে,

قَالُوْا یٰۤاَیُّهَا الْعَزِیْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَیْخًا كَبِیْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ،اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ.

"তারা বলল, হে আজিজ! এর (এ বালকটির) এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছেন (তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন) সুতরাং, তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন, আমরা আপনাকে সদাচারী হিসেবে দেখছি। [সূরা ইউসুফ, ১২:৭৮]

এ উভয় অবস্থা মানুষের জন্য এহসানের উদাহরণ। মুজাহিদদের জন্য অন্তরের পরিশুদ্ধতা অতীব জরুরি জিনিস। বিপরীতে খারাপ জিনিস হলো, জালেম এবং স্বৈরাচারীদের মত অন্তরে খারাপ জিনিস লুকিয়ে রাখা। এরকম হলে ক্রমান্বয়ে সেই মুজাহিদ চোর ডাকাতদের মত চরিত্রে পরিণত হয়। যদিও সে তাদের সাথে দীর্ঘদিন চলা-ফেরা করেনি তবুও সেই মুজাহিদ ডাকাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ধীরতা, ধৈর্যধারণ (গাম্ভীর্যতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধন):

اَنَا یُوْسُفُ

"আমি ইউসুফ"। [সূরা ইউসুফ, ১২:৯০]

এই পরিচয়টা হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) যথাস্থানে এবং যথাসময়ে প্রকাশ করেছিলেন। একদম শুরুতেই ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে দেননি। ধীরতা অবলম্বন করেছেন। ধৈর্য ধারণ করেছেন।

ধৈর্য এমন গুণ যা বড় ধরণের মহান ব্যক্তিত্বদের মাঝেই পাওয়া যায়। এসব কাহিনী থেকে যারা বড় হওয়ার আশা রাখেন তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। যে ধৈর্য ধরে কাজ করে সে খুব সহজেই সফল হয়। সে কোনো ধোঁকায় পড়ে না। মুজাহিদ এবং প্রত্যেক দাঈর জন্য জরুরি হলো ধৈর্য ধারণ করা, গাম্ভীর্যতা থাকা এবং মানুষকে চেনা। এর সব থেকে বড় প্রমাণ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর গাম্ভীর্য। যখন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর ভাইগণ তাঁর কাছে আসলেন,

فَدَخَلُوْا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ.

"ইউসুফের ভ্রাতাগণও শস্য ক্রয় করার জন্য (মিশরে) আগমন করল, অতঃপর ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেললেন; কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারল না"। [সূরা ইউসুফ, ১২:৫৮]

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে এই ভাইয়েরাই গর্তে ফেলেছিল। আজ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর কাছে তারা সাহায্যের আশায় এসেছে। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর নিজের পরিচয় দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

কিন্তু বিভিন্ন দিকে চিন্তা-ভাবনা করে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাদের কাছ থেকে পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলেন। ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তাঁর উপর দিয়ে নির্যাতনের স্টিম রোলার চলার কাহিনীকে গোপন রেখেছিলেন। গোপন রাখলেন কূপে পড়ার পর উদ্ধার হওয়া থেকে নিয়ে মিশরের বাদশাহর দরবারে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল কাহিনীকে। এভাবে অনেক দিন অতিক্রম হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে আসল ঘটনা প্রকাশিত হয়ে গেলো। পরিচয় দেওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এলো। তখন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) পরিচয় দেন এবং বলেন,

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَاۤ اَخِیْ

"তিনি বললেন, আমি ইউসুফ এবং এটি আমার (সহোদর) ভাই"। [সূরা ইউসুফ, ১২:৯০]

ভাইয়েরা তাদের ভুল বুঝতে পারল। অনুতপ্ত হলো। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) যদি একদম প্রথমেই নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দিতেন তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর বন্দিত্ব এবং ধৈর্য ধারণ - এগুলো পরীক্ষা ছিল। এগুলো কুরআনে লেখা হয়েছে যাতে করে আমরা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছ থেকে ধৈর্য, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি শিখতে পারি।

মিশরের বাদশা বলেন,

ائْتُوْنِیْ بِهٖ

"তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো"। [সূরা ইউসুফ, ১২:৫০]

এরপর তাকে কারাগার থেকে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন,

قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِكَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ.

"তুমি স্বীয় মনিবের নিকট ফিরে যাও, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে রমণীদের কী অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার রব এ নারী জাতির চক্রান্ত উত্তমরূপে অবগত আছেন"। [সূরা ইউসুফ, ১২:৫০]

কিন্তু ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)- নিজের উপর অর্পিত অপবাদ থেকে নির্দোষ ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কারাগার থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিলেন না। ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। এরপর তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁকে মিশরের রাজসভায় স্থান দেওয়া হয়। ধীর স্থিরতা, ধৈর্যের ফল সবসময় সুমিষ্ট হয়। যার জন্য ধৈর্য ধরা সহজ ব্যাপার হয়ে যায় তাঁর জন্য সুসংবাদ। মুজাহিদদের জন্য ধৈর্য এবং ভ্রাতৃত্ব উভয়টি খুবই জরুরি। বর্তমানের কুফুরি মতবাদে গড়ে ওঠা সরকারেরা জিহাদি আন্দোলনকে রুখতে মানুষকে বুঝাতে চায় তারা সব স্থানে জয়ী আছে। এ কারণে মুজাহিদদের এবং বিশেষ করে জিহাদি আমিরদের জন্য জরুরি ধৈর্যের শেষ সীমানা পর্যন্ত যাওয়া। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং দায়িত্বসমূহ ভালোভাবে আদায় করা।

মুজাহিদদের জন্য জরুরি হল - 'আহলুল হুল্লি ওয়াল আকদের' কথা অনুযায়ী চলা যতক্ষণ তাঁরা সত্যের পথ দেখান, ধৈর্য ধরা এবং ভ্রাতৃত্ব ধরে রাখা। কারণ এই উম্মত নেতৃত্ব থেকে অধৈর্য হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর এই ক্ষতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাবে। মুজাহিদ ও সাধারণ জনতা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
সবশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং শহীদী মৃত্যু দান করেন। আমীন।

(আমিনা কুতুব রচিত 'দিওয়ান আর-রিসালা' নিয়ে একটি পাঠচক্র)

এক শহীদের তরে

আবু আমের আন নাজি

"আমি সেই গৃহে বসে আপনার কাছে পত্র লিখছি, যার জন্য আপনি পরিশ্রম করেছেন। বহু প্রচেষ্টার পরে যা আপনি লাভ করেছেন। এই পত্র আপনার প্রতি আমার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন; সেই পুনর্মিলনের অভ্যর্থনা, যার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে এক সুদীর্ঘ সফর সমাপ্তির আর দুর্গম পথ পাড়ি দেবার। এই পত্র সুদূর অভীষ্ঠ গন্তব্যে যুগ যুগ ধরে চলমান কাফেলার সঙ্গে পথ চলার অঙ্গীকার। এ পত্র উৎসর্গ করছি আপনার প্রতি এবং সে সকল ব্যক্তির প্রতি, পথ কণ্টকাকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যারা দমে যাননি। অশ্রু দিয়ে লেখা এই পত্রের প্রতিটি অক্ষরের জন্য আমি লজ্জিত, আমি অপারগতা পেশ করছি কারণ, পথের মাঝে আপনি আমাকে একা ফেলে চলে গেছেন। এই পত্র বিচ্ছেদের অশ্রু দিয়ে লেখা; জীবন যাত্রায় পথ-সঙ্গীদের সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছায় চূড়ান্ত গন্তব্যে আপনার সঙ্গে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত অশ্রুর এই প্রবাহ চলমান থাকবে..."

—আপনার জীবন সঙ্গিনী।

লেখিকার উৎসর্গ বাণীর কয়েকটি লাইন তুলে ধরলাম। হ্যাঁ, লেখিকার সেই কবিতাগুচ্ছের কথাই বলছি, যা তিনি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া স্বামীর বিরহ-বেদনায় রচনা করেছিলেন। নিঃসঙ্গ জীবনের অব্যক্ত যন্ত্রণা সইতে না পেরে তিনি কলম ধরেছিলেন। যতদিন স্বামীর সঙ্গে ছিলেন, তার প্রতিটা সময় আল্লাহর রাস্তার বিপদাপদে ধৈর্যের পথের পাথেয় ছিল। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের একেক বছর পর তিনি এই কবিতাগুচ্ছের একেকটি পংক্তি রচনা করেছেন। কবিতাগুলোতে উঠে এসেছে বিরহের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। জীবন্ত হয়ে উঠেছে বিচ্ছেদের অসহনীয় ব্যথা। মিলনের ব্যাকুলতা। একাকীত্বের অসহ্য যন্ত্রণা। জীবন যাত্রার প্রতিকূলতা। কিন্তু তবুও, নারীস্বভাবের দুর্বলতা সত্ত্বেও কবিতার প্রতিটি চরণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে এই বিপদের প্রতিদান কামনা, পরকালে আল্লাহর চিরসত্য প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে স্বীয় মনকে সান্ত্বনাদান এবং প্রয়াত স্বামীর ত্যাগ-তিতিক্ষার আদর্শকে আমরণ আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা পাঠককে বিমোহিত না করে পারেনা। বাস্তবেও তিনি সেই অঙ্গীকারের ওপর অটল থেকে আটানব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; এক মুহূর্তের জন্য আদর্শকে বিকিয়ে দেননি। আত্মমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেননি। আল্লাহ তাঁকে যথার্থ প্রতিদান দান করুন এবং আল্লাহই তাঁর জন্য যথেষ্ট! জগৎ এক মহতী নারী দেখেছিল। তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ, তাঁর ধৈর্য্য, তাঁর আদব ও শিষ্টাচার, তাঁর দুঃখ-বেদনা, তাঁর ভাষার মাধুর্য— সবকিছুতেই রয়েছে জগৎবাসীর জন্য বিরাট শিক্ষা। আর তা কেনই বা হবে না, তিনি যে সম্মানিত কুতুব পরিবারের সদস্য! আল্লাহ রহম করুন সাইয়্যেদকে! রহম করুন মুহাম্মাদকে! রহম করুন হামিদাকে!... আল্লাহ রহম করুন এই কবিতাগুচ্ছের রচয়িতা আমিনা কুতুবকে!

আমিনা কুতুব! ইনিই তো সেই মহিলা, যার ভাই শহীদ সাইয়েদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ কারা-সঙ্গী কামাল আল-সানানিরি-এর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কাছে। তিনি ভাইয়ের সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন অথচ কামাল আল-সানানিরি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত (২৫ বছর)। তিনি কারাবরণ করেছেন খুব বেশিদিন হয়নি, এরমধ্যেই আদি গোত্র 'কেনানা'র ভূমিপুত্র শ্রেষ্ঠ যুবকদেরকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপকারী মিশরের তাগুতগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আমিনা এই বিবাহ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

'মনে পড়ছে সেদিনের কথা, আপনি কারাগারের ভেতর ছিলেন আর এই অবস্থায় আমাদের বন্ধন তৈরি হলো, যাতে হেদায়েতের পথে আমরা একই সঙ্গে চলতে পারি...

নির্যাতন-নিপীড়ন যেমনই হোক না কেনো, তা মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এবং লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে...'

আমিনা এই বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন এমন একটা সময়ে, যখন কামাল আল-সানানিরির জন্য তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছে। কামাল আল-সানানিরি তাঁর স্ত্রীর পরিবারের চাপে অনেক আলোচনার পর তাকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছেন। সাইয়্যেদা আমিনা নিজের এই বিবাহ সম্পর্কে

বলেন: "আমাদের এই বিবাহ ছিল স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক জালিম শাসকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রকম চ্যালেঞ্জ ঘোষণা। সে ইসলামের দাঈদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে ফেলেছিল —তা হত্যা করেই হোক কিংবা আজীবন কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতে তাঁদের আবদ্ধ রেখেই হোক।
আমিনা নিয়মিত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কারারুদ্ধ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। পথের কষ্ট, কারারক্ষীদের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি ভোগান্তি সয়ে তাঁকে প্রিয়তম স্বামীর কাছে পৌঁছুতে হতো।

'আমি (আমরা) পথচলা অব্যাহত রেখেছি, সময়ের কষাঘাত অথবা হুমকি-ধমকির ভয় করিনি। সেসব তাগুতদের হুমকি-ধমকি, যারা আমাদের রক্তকে হালাল করেছে অথবা ইহুদিদের তল্পিবাহকদের (হুমকি-ধমকি)'।

প্রতিবারের সাক্ষাতে স্ত্রীকে এত এত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, কামাল আল-সানানিরি যখন এটা দেখলেন, স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "প্রিয়তমা! বিয়ের সময় তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম, আজ সেটা আবারও তোমাকে বলতে চাই। আমি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত। আগামীকালই বের হয়ে যেতে পারি আবার সাজার বাকি ২০ বছর শেষ করেও বের হতে পারি। হে স্ত্রী! তারা আমাকে জামিন দেয়ার জন্য এই শর্ত পূরণ করতে বলে যে, আমি আমার দ্বীনের ওপর এই দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবো। এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমার অবস্থান থেকে সরে আসবো। আল্লাহর কসম! আমি কখনোই তাদের সে আশা পূরণ হতে দেবো না, যদিও আমার এখান থেকে বের হওয়ার অর্থ হলো—তোমার সঙ্গে পরম মিলন। হে প্রিয়তমা! আমাদের মুক্তির বিনিময়ে তারা আমাদেরকে এই স্বৈরাচারী শাসকের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতে বলে। তোমাকে বলে রাখি, আল্লাহর ইচ্ছায় কখনই তারা আমাদের থেকে সমর্থন পাবে না যদিও আমাদের অঙ্গ বিচ্ছেদ করে দেয়া হয়। তাই, এখন থেকে তোমার এক্তিয়ার।

এ বিষয়ে তুমি তোমার রায় আমাকে লিখে পাঠাও। আল্লাহ তোমাকে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নেয়ার তৌফিক দান করুন! তাই তোমার কাছে আমার প্রস্তাব, আমাদের এই সম্পর্ক, যা আমাদেরকে পরস্পরে কাছাকাছি করেছে, তা এখানেই শেষ হয়ে যাক। যাতে তোমার যৌবন এভাবে নষ্ট না হয়ে যায়। যাতে আরো কয়েক বছর তুমি এভাবে বিপদাপদে আটকে না থাকো। যাতে তোমার সৌভাগ্যের পথে আমি কাঁটা হয়ে না থাকি।" আমিনা স্বামীর সব কথা শুনলেন। কিন্তু কারারক্ষী তাঁকে আর জবাব দেয়ার সময় দিলো না। তাই পরবর্তীতে তিনি স্বামীর প্রস্তাবের ওপর এই জবাব লিখেন: 'হে আমার আশার আলো প্রিয়তম স্বামী! আমি জিহাদ এবং জান্নাতের পথ বেছে নিয়েছি। আমি ধৈর্য এবং ত্যাগের পথ গ্রহণ করেছি। আমি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে তোমার শেখানো বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাসের ওপর অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'সময়ে সময়ে কত বিপদ আমাদের জেঁকে ধরেছে, কখনোই আমরা দমে যাইনি। কখনোই পিছিয়ে আসিনি। জীবনের পরোয়া করিনি। আমরা অবিরত পথ চলেছি যদিও কাপুরুষের দল ষড়যন্ত্র করে গিয়েছে'।

তিনি জানতেন, সরকারের কাছে করুণা ভিক্ষা চাওয়া হলে স্বামীর মুক্তি মিলে যাওয়াতে কারাগারের বাইরে তাদের বিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু তিনি স্বামীকে তা করতে বলেননি। বরং তিনি দেখলেন, আত্মসমর্পণ অথবা করুনা ভিক্ষা যেভাবেই স্বৈরাচারী শাসকের প্রতি নমনীয়তা হোক না কেনো, এটা থেকে স্বামী প্রিয়তম যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে তা হবে তাঁর জীবনের এক অনন্য সম্মান ও মর্যাদার কারণ। তাই এক কবিতায় তিনি স্বামীর আদর্শানুবর্তিতার প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেন:

'আপনি কোনোদিন তাগুত গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করে আন্তরিকভাবে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেননি, কোনোদিন কোনো কাপুরুষের কাছে মাথা নত করেননি। (এমন হয়নি যে,) এর বিনিময়ে দূরত্বের ওই শেষ সীমায় থাকা স্ত্রী-পরিজনকে আপনি কাছে পেতে চেয়েছেন, যাদেরকে কয়েক বছরের একাকীত্ব কাহিল করে দিয়েছে। আপনি পাপিষ্ঠের দলকে বলেননি, আমি এমন গৃহ চাই, যার জন্য আমি ভীষণ আগ্রহী। যার জন্য আমি অধীর ও ব্যাকুল'।

বছরের পর বছর কেটে গেল। অবশেষে এ অবস্থায়

সতের বছর সমাপ্ত হলে আল্লাহর ইচ্ছায় স্বামী কারাগার থেকে বের হন। কিন্তু ততদিনে স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশের কোঠায় চলে যায়। তাই তাঁদের ভাগ্যে আল্লাহর তকদির অনুযায়ী কোনো সন্তান জুটেনি। কারণ স্ত্রীর যৌবনের পুরোটা সময় স্বামীর অপেক্ষায় কেটে গিয়েছে।

'আমি কেমন করে ভুলতে পারি উন্নত শির এবং অটল ঈমান নিয়ে কারাগার থেকে তাঁর বের হওয়ার সেই স্মরণীয় দিনটিকে, পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকের কঠোরতার মাঝে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর যেদিন শৃঙ্খল চূর্ণ হলো। অতঃপর আমরা জীবনের পথে হেঁটেছি, আমাদের এই পারস্পরিক মিলনের সুযোগ দানের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি প্রতিনিয়ত। আমরা এমন এক জগতের জন্য প্রতিযোগিতা করি যা ধ্বংসশীল; দুর্ভাগ্য আর অকল্যাণ যার সর্বত্র'।

অতঃপর তাঁর স্বামী আফগানিস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও হিজরতের উদ্দেশ্যে। সেখানে সর্বপ্রথম যাঁরা হিজরত করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এমনকি তিনি তো এমন ব্যক্তি, যিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাকে সেখানে হিজরত করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের জিহাদের সওয়াব এই স্বামীকেও দান করেন! নিম্নোক্ত কবিতাগুলোতে স্ত্রী কারাগারে এতগুলো বছর অতিবাহিত করা সত্ত্বেও জিহাদ এবং দাওয়াতের পথ আঁকড়ে থাকার প্রতি নিজ স্বামীর আকুলতা তুলে ধরেন—

'অবশেষে আল্লাহ তাদের শৃঙ্খল চূর্ণ করতে চাইলেন এবং লাঞ্ছিত ধ্বংসশীল দুরাচারীকে নিঃশেষ করে দিলেন। তখন আপনি দুঃখ বেদনা মাড়িয়ে উচ্চ মনোবল নিয়ে পথ চলতে থাকলেন। আপনি কখনোই বলেননি, প্রেমের যাদুমাখা নির্ঝঞ্ঝাট ঘরোয়া জীবনে নিস্তেজ ও স্থবির হয়ে পড়ে থাকবেন। সেসব দিনের পরিবর্তে, যে দিনগুলো আপনি সেখানে কাটিয়েছিলেন ভয়-ভীতি আর কারারক্ষীদের নির্যাতনের মাঝে। আপনি নিজ সময়কে দ্বীনি কাজকর্ম, রোজা অথবা প্রতিবার আযানের সময় নামাজ— এগুলোর মাঝেই বন্টন করেছিলেন। একসময় জিহাদের আহ্বানকারীর ঘোষণা এল, তখন সত্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে আপনার জিহ্বায় ছিলনা কোনো প্রকার জড়তা। অতএব, আপনি সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে (রণাঙ্গনে) উপস্থিত হতে বেরিয়ে পড়লেন'।

কামাল আল-সানানিরি মিশরে ফিরতে না ফিরতেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে তাগুত সরকারের হাতে পড়ে গেলেন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্তানের মুজাহিদদের একান্ত গোপনীয় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করা। কিন্তু তা কি আর সম্ভব! তাই জেরার সময় নির্মম নির্যাতনের কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (আল্লাহ তায়ালা অপার অনুগ্রহের প্রশস্ত চাদরে তাকে আবৃত করে নিন!) আর এটাই ছিল স্ত্রীর সঙ্গে এই পৃথিবীতে তাঁর দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ স্থায়ী বিচ্ছেদ। আল্লাহর ইচ্ছায় পরকালে তাঁদের এই বিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটবে। তাঁদের এই বিচ্ছেদ ছিল এক মর্যাদাপূর্ণ বিচ্ছেদ; কারণ সে সময়টাতে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও দাওয়াতের ময়দানে ছিলেন। আর এ কল্পনাই স্বামীর মৃত্যুর পর একাকী জীবনে স্ত্রীকে সান্তনা যুগিয়েছে।

'আমি সান্ত্বনা লাভ করি এ কথা স্মরণ করে যে, (কামাল) আমার দ্বীনের সম্মান রক্ষার জন্য জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছেন। তিনি দুর্বলের ন্যায় মারা যাননি, তাই নিয়মিত তাঁর মৃত্যু-স্মরণ আমাকে লজ্জা দেয়। আমি এই ভেবে আশ্বস্ত হই যে, জীবন তো শেষ হয়েই যাবে আর অল্প সময়ে পরই এই যেন আগামীকালই আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হব'।

এক শহীদের প্রতি উৎসর্গিত একগুচ্ছ কবিতা—
আবেগঘন অনেক শোকগাঁথা আমি পাঠ করেছি, কিন্তু এই কবিতাগুলো পাঠ করে এতটাই প্রভাবিত হয়েছি যে, যখনই পড়ছিলাম, অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। কবিতাগুলোর ভাষা এতটাই শক্তিশালী, এতটাই অলংকৃত তার রচনাশৈলী, আমার পক্ষে তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি শুধু মুজাহিদা এই বিধবা নারীর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরব যে, স্বামী তাঁকে এই পৃথিবীতে একা ফেলে যাবার পর তিনি কেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন?
আমরা আফগানিস্তান এবং ওয়াজিরিস্তানে এরকম কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন আরও বেশ ক'জন বোনকে পেয়েছি। দেখা যেত, এখানে এক বোন

তার পিতা ও স্বামী হারিয়েছেন। ওখানে আরেক বোন পরপর দুই সন্তান হারিয়েছেন, এরপর স্বামীর মৃত্যু হলে আরো দুই সন্তান হারালেন। এমন যে আরও কতজন রয়েছেন! আলোচ্য কবিতাগুচ্ছে এই বোনদের নামগুলো উঠে এসেছে।

তাদের মানবেতর জীবনচিত্র এমন আবেগপূর্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, নির্মল প্রেম আর ভালোবাসার পবিত্র অনুভূতি উথলে ওঠে। লেখিকা নিজ ভাইয়ের টর্চারসেলের ওসিয়তগুলো অভিনব পন্থায় বাস্তবায়ন করেছেন। আমিনা কুতুব বলেন: "কারাগারের দেয়ালে আবদ্ধ থাকাকালে আমাদের সবার প্রতি ভাইজানের ওসিয়ত ছিল, কবিতা-ঘটনা—যা কিছুই আমরা লিখি, তা যেন আমাদের ঈমানী চেতনা থেকে উৎসারিত হয়। ভাষা বর্ণনা, গদ্য ও পদ্য রচনার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা, দর্শন ও অনুভূতি যেন সম্পূর্ণরূপে জাহিলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। আমরা যেন সদা-সর্বদা স্বচ্ছ ইসলামী সাহিত্য সৃজনে মনোযোগী থাকি।"

'এখন থেকে আর কখনো আপনি আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে না আমায়। আপনার পথ পানে চেয়ে থাকব না আর কভু ওই সাঁঝের বেলায়...'

আহ! একেকটি চরণের কি অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য! কী প্রগাঢ় সংবেদনশীলতা, যা বিশ্লেষণ ও স্মৃতির প্রতিটি মুহূর্তের কথা বলে মনোজগতে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। তাইতো স্ত্রী, স্বামীর প্রতিটি পদক্ষেপ, ঘরে প্রবেশের সময় তাঁর নির্মল হাসিরও স্মৃতিচারণ করছেন। প্রিয়তমের ব্যক্তিত্বের আভায় কিরূপে গৃহের সোপান হত প্রভাময়! -এমন স্মৃতি তাঁকে কাঁদাচ্ছে। তিনি পাড়ার কুকুরের ডাকটুকুও ভুলতে পারছেন না; স্বামীর ব্যাপারে যে কুকুরের ভয় ছিল তাঁর মনে। এখন সেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ তাকে পীড়া দেবে, কারণ অভ্যাসমতো তাঁর দরজায় স্বামী যে আর কখনোই করাঘাত করবেন না!

'আপনি ফেরার অপেক্ষায় বুক ভরা আশা নিয়ে আর কখনোই আমি স্টেশনে আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকব না। পাড়ার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আর আমাকে বিরক্ত করবে না। কুকুর উত্তেজিত হয়ে নির্বোধের মতো আপনাকে না কামড়ে ধরে— এই ভীতি আর কখনো আমায় তাড়া করবে না। আপনার প্রত্যাবর্তনের, আপনার সঙ্গে কথা বলার ও পারস্পরিক সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আর কখনো আমি বসে থাকব না। দিন শেষে আমার দৃষ্টি-পথে আপনি আর কখনো পা ফেলে এগিয়ে আসবেন না। ক্লান্তি মাখা হাসি মুখে আপনার সামনে এসে দাঁড়ানো আর তখন আমার ছুটে যাওয়া আপনার কাছে— কোনো কিছুই আর হয়ে উঠবে না। আপনার পদভারে ধন্য ঘরের সিঁড়িগুলো আপনার আলোয় আর কখনোই হেসে উঠবে না'।

এসমস্ত প্রেমময় অনুভূতির পর সুসাহিত্যিক এই নারী নিজ স্বামীকে তাঁর মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞেস করে নিজেই আবার তার জবাব দিচ্ছেন। কারণ তিনি তো জানেন, প্রিয়তম স্বামী আল্লাহর রাস্তায় তাঁকে রেখে গিয়েছেন।

'কিসের আগ্রহে আপনি চলে গেলেন? জান্নাতের আগ্রহে না আসমানের মালিকের ভালোবাসায়? কিসের আশায় আপনি বিদায় নিলেন? আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে? প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় হয়ে গিয়েছে কি? আর তাই ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে উন্মাদ প্রেমিকের মতো আপনি ছুটে গেলেন'?

অতঃপর তিনি আল্লাহর ওয়াদার কথা বলে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেন এবং পথচ্যুত না হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কবিতার ভাষায় তাই তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করছেন:

'ওগো! ওপারে প্রিয় মানুষগুলোর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছে কি? পুনর্মিলনের সেই রঙিন আনন্দ আপনার কেমন লেগেছে, বলুন না আমায়? কেমন অনুভূতি হচ্ছে আপনার প্রতিদান দাতা রবের সান্নিধ্যে, ফেরদৌসের আঙ্গিনায়, রবের ভরপুর দানের ওই খাজানায়? চিরসত্য সেই গৃহে, যেখানে আপনারা সসম্মানে নিরাপত্তার সঙ্গে হয়েছেন সমবেত? এই সবকিছু যদি হয় সত্য, তাহলে আপনার মৃত্যুতে, আপনার রক্ত ঝরানোতে আপনাকে জানাই অভিনন্দন! নিশ্চয়ই অচিরেই সেখানে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে আর এই অভাগা পৃথিবী আমার দৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে যাবে। শীঘ্রই আপনার

সঙ্গে মিলন ঘটবে, যখন প্রতিশ্রুতির তারাগুলো বাস্তবতার আকাশে ঝলমল করবে। দুর্যোগ দুর্দশায় কাটানো দিনগুলোর কোলে আর কিছু দিন কাটাব আমরা এরপর চিরকালের জন্য আশ্রয় নেব এমন এক ঠিকানায়, যেখানে থাকবেনা ধ্বংসের ভয়। থাকবেনা বিরহের আশঙ্কা'।

তাঁর জীবন-অধ্যায়ের কয়েকটি উজ্জ্বল পাতা:

নিম্নোক্ত কবিতাগুলোতে লেখিকা নিজ স্বামীর জীবনে একটি ভুল হলেও খোঁজার চেষ্টা করছেন, যাতে বিরহের যাতনায় বেদনাক্লিষ্ট ও প্রেম-দগ্ধ হৃদয়ের দহন কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়। কিন্তু তিনি তেমন একটিও ত্রুটি খুঁজে পাননি স্বামীর জীবন অধ্যায়ে। পেয়েছেন শুধু ভাষার সংযত ব্যবহার, উন্নত জীবনাচার, কারাজীবনের ধৈর্যধারণ, আল্লাহর রাস্তায় বিপদ সহ্য করা, তাগুতগোষ্ঠীর বিরোধিতার মত উচ্চ গুণাবলী।

'যৌবনকালে আমি (তাঁর ত্রুটি) সন্ধান করেছি, কিন্তু এমন কোনো ত্রুটিপূর্ণ কাজ আমি পাইনি, যা দেখে কাপুরুষও লজ্জা পেতে পারে। রসনা সংবরণ ছিল তাঁর ভূষণ। তাঁর জীবনাদর্শকে কলুষিত করে, এমন ছোটলোকি বাক্যালাপ তিনি পরিহার করে চলতেন সচেতনভাবে'।

অতঃপর তিনি কারাজীবনে স্বামীর দৃঢ়তা, তাগুতগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর ও অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের অনমনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন।

'কত রকম কূট-কৌশল করে তারা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে তবুও সুদৃঢ় প্রাচীরে তারা সামান্যই ফাটল দেখতে পেয়েছে। সেই অটুট প্রাচীরের ভেতর এমন একদল সিংহ রয়েছে, যারা অবর্ণনীয় নিপীড়নের শিকার হয়েও একটি শব্দ অথবা কিছুটা নম্রতা'র মাধ্যমে আপসকামিতা'র জঘন্য পাপকে ছুঁড়ে ফেলেছে'।

অতঃপর তিনি নিজ অভ্যাসমতো এমন কিছু কবিতার দ্বারা দুঃখ ও বিরহের এই কবিতামালা সমাপ্ত করলেন, যা প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা ও নির্ভরতারকে বাড়িয়ে দেয়।

'আমি বেঁচে আছি কারণ নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য আমি আপনাদের পথকে উত্তম পথ হিসেবে বুঝতে পেরেছি। সেখানে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। সাক্ষাৎ ঘটবে ভাইজান সাইয়্যেদের সঙ্গে। মনোরম উদ্যান আর চিত্তাকর্ষক নহরের সমাবেশে। আমি এখন থেকে আপনাদের উভয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়েই যাব।
আর আল্লাহর কাছে কামনা, তিনি যেন আমার সাহায্যকারী হন'।

কিছু বেদনাদায়ক স্মৃতিচারণ:

এই এক গুচ্ছ কবিতায় ওই সময়টা প্রতিফলিত হয়েছে, স্থিতিপূর্ণ একরাতের যে সময়টায় তাঁর স্বামীকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে; দুর্বৃত্তদের দুরাচার যে রাতটিকে কলুষিত করেছে।

'নিকষকালো অন্ধকার রজনীতে নিকৃষ্ট কাফের ও ঘৃণ্য গাদ্দারের দল যখন আমাদেরকে ধ্বংস করে দিলো, তখন মৃত্যু নিনাদের বুকফাটা আঘাতে রাতের নিস্তব্ধতা চিরে খানখান হয়ে গেলো'। এরপর মহীয়সী এই নারী তাঁর স্বামীর প্রতি সরকারের পীড়াপীড়ি ও চাপ প্রয়োগের বিষয়টি তুলে ধরেছেন: 'তারা পাহাড়সম ঈমান কিনে নিতে দরকষাকষি করল। কিন্তু অটুট ঈমান কারাগারের নিপীড়ন-বেদনাকে হারিয়ে দিল। এভাবেই আপনি সফল হয়ে গেলেন আর ঈমানের প্রতিদান হিসেবে স্থায়ী জান্নাত ছাড়া আর সবকিছুকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেদিন থেকে আমি কখনো জীবন-মরণের মাঝে কোন পার্থক্য রেখা দেখতে পাইনি'।

এরপর তিনি পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী স্বামীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করছেন:

'এতকিছুর পরেও আমাদের মধ্যকার অঙ্গীকার সদা অটুট, নির্মল সত্য-বিশ্বাস আমাদের পূর্বের মতোই। তারা অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়েছে কিন্তু আমাদের মৃত্যুমুখী শরীরের কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরানো আর কিছু মাটি মেশানো ছাড়া তাদের কি-বা লাভ হয়েছে? তাদের ক্রোধ উদ্রেকের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তাঁরা আল্লাহর আযাব এবং লাঞ্ছনাকর অপদস্থতার অঙ্গীকারপ্রাপ্ত। তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে,

আল্লাহর অভিশাপ মানব সমাজের প্রত্যেক মালাউন দাম্ভিকের ওপর! অপরদিকে আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা জগৎ স্রষ্টার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার সামনে রেখে পথ চলছি'।

আল্লাহর নিয়ামতের সাগরে:

নিম্নের কবিতাগুলোতে লেখিকা দাওয়াত এবং জিহাদের পথে আমৃত্যু স্বামীর অবিচলতার বর্ণনায় ডুবে গেছেন। তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর স্বামী কেমন করে বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এবং সুদীর্ঘ কারা জীবন কাটিয়ে এসেও এ পথ আঁকড়ে ছিলেন! কাসিদা'র শেষাংশে তিনি স্বামীর কাছে দোয়া চাচ্ছেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাফেলা এবং ভাইজান সাইয়্যেদ কুতুবের কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তৌফিক তাকে দান করেন!

'আপনাদের কী হল, স্থায়ী আবাসের আকাশের দিকে ফিরে সর্বশক্তিমান দয়াময় মালিকের কাছে কামনা করছেন না, যেন তিনি আমার এই ভারী উৎকণ্ঠাকে হিসাবের দিন আমার মুক্তির কারণ বানিয়ে দেন! কারণ আমি তো এই অপেক্ষায় রয়েছি, তিনি তাঁর জান্নাতের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দেবেন আর জীবনের কাঁটাযুক্ত পথযাত্রার কষ্টগুলোকে মিটিয়ে দেবেন! উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আমি আজ ক্লান্ত। বিচ্ছেদের তরবারী আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে'।

'মরীচিকার দেশ থেকে...তুমি কি দেখতে পাও আমাদের সম্মিলিত পথচলা'?

আমাদের মাঝে কে আছে, সুমিষ্ট স্বরে এই কাব্যমালার আবৃত্তি শোনেনি? সেই কবিতাগুচ্ছ, যা মহীয়সী এই নারী, স্বামীর শাহাদাতের তিন বছর পর রচনা করেছেন। সেখানে তিনি নিজ স্বামীর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেছেন।

'আমরা কি সত্যের পথে একই সঙ্গে যাত্রা করিনি? যাতে অকল্যাণের ভূমিতে কল্যাণ ফিরে আসে। আমরা অন্ধকার পথের অনুসারী তাগুতগোষ্ঠীর মোকাবেলা করেছি, যারা অপদস্থতার জিঞ্জির দিয়ে মানুষদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। যারা ব্যবহারিক জীবনাচার থেকে আল্লাহর দ্বীনকে দূরে সরিয়ে কেবল কিতাবের পাতায় কয়েকটি লাইনের ভেতর তা সঙ্কুচিত করে ফেলেছিল। আমরা কাঁটাযুক্ত পথে এভাবে যাত্রা করেছি যে, (জাগতিক) সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়েছি'।

তিনি যথার্থই বলেছেন। এ পথে যে চলে, তাঁকে জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু এমন ব্যক্তির পরিণাম হল, তাঁর আত্মা এমন প্রেমে মত্ত থাকে, পরলৌকিক এমন স্বপ্ন আর আশায় বিভোর থাকে, যেমনটা আল্লাহ নিজ বান্দাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন। লেখিকা অভিনব রচনাশৈলী দিয়ে প্রিয়তম স্বামীর বিয়োগ বেদনা ও বিরহ যাতনার চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন। অতঃপর আরো অভিনব আঙ্গিকে নিজ অভ্যাস অনুযায়ী পূর্ব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—

'আমার রাতে আর কখনো তিনি আলো হয়ে ফেরেননি। প্রদীপের সমস্ত আলো আজ নিভে গেছে। তবুও আমি পথ চলা অব্যাহত রাখব; আপনি যেমন অনমনীয়তার দ্যুতি ঠিকরে বের হওয়া চেহারায় আমার সামনে আসতেন, তেমনি কঠিন অবিচলতায়...

আমার শির সদা উন্নত থাকবে। দুর্বলতাবশত কোনো কথা বা জবাবে তা হবে না নত। অচিরেই আমার অবশিষ্ট রক্ত আমাকে সম্মুখ পানে এগিয়ে নেবে; যে রক্ত জীবন পথের প্রতিটি গলি-ঘুপচিকে আলো দিয়ে ভরিয়ে দেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় জান্নাতের পাড়ে সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়নকারী হিসেবে আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে'।

শহীদদের জন্য কয়েকটি চরণ..
খালেদ এবং তার সঙ্গী-সাথীরা:

এই কাব্যমালা বীর মুজাহিদ শহীদ (আল্লাহ চাহেন তো আমরা তেমনটাই আশা করি) খালেদ স্তাম্বুলীর জন্য। মুজাহিদা লেখিকা এভাবেই এই বীর সেনা এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য কবিতা রচনা করেছেন, যারা মিশরকে স্বৈরাচারী সাদাতের হাত থেকে মুক্ত করে দেশ ও জনগণকে শান্তি উপহার দিয়েছিলেন।

'হে আকাশ! তুমি বিলাপ করো; শোকের গীত তুমি গেয়ে যাও। উচ্চ মর্যাদা এবং স্থায়ী আবাস জান্নাতের জন্য অঙ্গীকার পূরণের সময় হয়ে এসেছে। ইহুদিদের স্বার্থে নিরীহ মানুষ হত্যাকারী দাসগোষ্ঠীকে একদল যুবক অপদস্থ করেছে। একদল যুবক দূর থেকে এসেছে, যারা মর্যাদাবান মাবুদের দেয়া অঙ্গীকার অনুসরণ করে পথ চলেছে। তাঁরা, তাঁদের রক্তের বিনিময়ে স্থায়ী আবাস লাভের আশায় এমনটি করেছে। তাঁরা খোদাদ্রোহী দাসদের সামনে মাথা নত করেনি। তাঁরা হিংসুটে ক্রুসেডারদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। তাঁরা অনন্ত জীবনের অভিলাষীদের জন্য পথ রচনা করেছে। তারা এক মূল্যবান প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে রক্ত ঝরিয়েছে'।

প্রতিশ্রুত বিজয়:

এই কবিতায় লেখিকা মুসলিম উম্মাহর কাছে এ বার্তা দিতে চাচ্ছেন যে, নিঃসন্দেহে বিজয়ের প্রকৃত পথ হল— জিহাদ এবং শাহাদাতের পথ। তিনি বলেন:

**

'তোমরা দ্বীনের গৌরবের পতাকা ছেড়ে গিয়ে যে পথে যে পন্থায়ই কোনো বিজয় আশা করো না কেন, তা হবে মরীচিকা। তাই তোমরা সঠিক পথে ফিরে এসো। নতুন করে পা ফেলো। এমন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও, যা কখনো পথ হারাবে না। মাবুদের এমন পতাকাতলে সমবেত হও, যেখানে কোন শিরক থাকবে না। কোষমুক্ত তরবারী উঁচু করে এগিয়ে চলো দুর্বার। আজান হাঁকো জিহাদের। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির ঘোষণা করো । কারণ এ পথই হলো বিজয়ের ও সম্মানের পথ। যেমনিভাবে খাইবার বিজয় ছিল আমাদের জন্য সাহায্য আর কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর দেশান্তর। আল্লাহর তরে জিহাদ ব্যতীত অপদস্থতার নিশানা দীর্ঘ যুগ ধরে থাকবে অনড় । তখন বিজয়ের স্লোগান হয়ে যাবে এমন এক প্রথা মাত্র, যুগ যুগ ধরে যা উপহাসের পাত্র বানাবে এই উম্মাহকে'।

আল্লাহ আমিনা কুতুবের উপর রহম করুন! তাঁর সকল ভাইদের উপর এবং প্রিয়তম স্বামীর প্রতি দয়া করুন!! আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন তাঁদের সকলকে নবীগণ, সিদ্দিকগণ এবং শহীদগণের সঙ্গে ফেরদৌসের শ্রেষ্ঠ ঠিকানায় একত্রিত করেন! আমীন।

(শেষ পর্ব)

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ’র সম্মানিত স্ত্রী

উমায়মা হাসান আহমাদ- এর লেখা আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক রচনা

বিশুদ্ধ রক্তস্নাত আফগান

তারপর তাঁরা আমাদেরকে একটি বড় বাসে করে দ্রুত নিয়ে গেল। আমরা মেয়েদের খোঁজ করছিলাম। প্রতিটি বাড়িতে থেমে থেমে জিজ্ঞেস করছিলাম আর তারা বলছিল: এখানে কেউ নেই। অবস্থা দেখে অস্থিরতা আমাদের পেয়ে বসেছিল। সবার চোখ দিয়েই পানি ঝরছিল।

আমরা তাদের কথা জিজ্ঞেস করতে করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলাম। লোকেরা আমাদেরকে একটি বাড়ির কথা বলল। অতঃপর আমরা সে বাড়িতে যেয়ে পৌঁছলাম। তারা আমাদেরকে বলল: আপনারা ভেতরে প্রবেশ করুন, মেয়েরা ভেতরে আছে। আমরা সকলে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। তাই আমরা বাইরে থেকেই ডাকতে লাগলাম: ও হাজের..., ও ঈমান..., ও নাবিলা...., ও খাদিজা....।

আমরা তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারা আমাদের দিকে দৌঁড়ে এলো। আর সকলেই জিজ্ঞেস করল: আমার মা কোথায়? আমার বাবা কোথায়? আমার ভাইয়েরা কোথায়? আমরা তাদেরকে বললাম: তোমরা অস্থির হয়ো না। তাঁরা সকলেই এসে পৌঁছাবেন ইনশা আল্লাহ। আমরা দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত এ বাড়িতে অপেক্ষা করলাম এই আশায় যে, হয়ত আল্লাহ অবশিষ্টদেরকে বাঁচাবেন।

আমরা আশায় ছিলাম, হয়ত আল্লাহ পুরুষ ও বড় ছেলেদের কাউকে বাঁচাবেন, ফলে আমাদের অন্তরগুলো প্রশান্ত হবে। কিন্তু তাঁরা সকলেই আল্লাহর পথে নিহত হলেন। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদা লাভ করলেন। আমরা তাদের ব্যাপারে এ ধারণাই পোষণ করি। তবে, আল্লাহই তাদের প্রকৃত হিসাবরক্ষক। সকাল হওয়ার পর আরব ভাইয়েরা এসে বলল: চলুন আমরা অন্যস্থানে যাই। আমরা খুবই বেহাল অবস্থায় ছিলাম। আমাদের কারো পায়ে জুতা ছিল না। আমাদের সকলের পোষাকগুলো বারুদ, রক্ত ও ছোট বাচ্চাদের পেশাবে ভরা ছিল। আমাদের সাথে ডক্টর আয়মানের ছোট মেয়ে আয়েশা ছিল। তারা তাকে কতগুলো ভগ্নাবশেষ থেকে বের করেছিল। তার উভয় হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। এক হাঁটু ভাঙ্গা, আরেকটি আহত। তাই তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা তার উভয় পা বেঁধে দিল। তারা আমাদের নিয়ে খোস্তের পথ ধরল। রাস্তায় আমরা অনেক গাড়ি দেখতে পেলাম। মানুষ বলাবলি করছিল: রাস্তা বন্ধ, আমরা রাস্তার শেষ পর্যন্ত যেতে পারব না। তাই, তারা আমাদেরকে রাস্তার পাশের একটি বাড়িতে থামাল। আমাদের সাথে আমাদের বন্ধুবর কিছু আরব পরিবারও থামলেন। তাঁরা আমাদের অবস্থা দেখে প্রচন্ড বিস্মিত হলেন। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনাদের কী হয়েছে? আমরা যা ঘটেছে তা তাঁদের নিকট বর্ণনা করলাম। তাঁরা এগুলো কিছুই জানতেন না। আমাদের জন্য প্রচন্ড কষ্ট পেলেন তাঁরা।

অতঃপর ডক্টর আয়মানের ছোট কণ্যা আয়েশার জন্য ভাইয়েরা ঔষধ আনল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম, তার মাথাও একটু ফুলে গেছে। তাই, আমরা তার ব্যাপারে শঙ্কিত হলাম। সে এক অসহায় মেয়ে, নিজ স্থানেই ঘুমিয়ে ছিল। মাঝে মাঝে তার মা'র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল। তার সাথে তার দুই বোন ছিল। তারা তার সেবা করছে। সন্ধ্যাবেলা সে ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে লাগল। আমি ও তার বড় বোন নাবিলা তার নিকট দৌঁড়ে আসলাম। সে বমি করতে লাগল। বমির সাথে ছিল রক্ত। আমরা তার অবস্থা দেখে খুব পেরেশান হয়ে গিয়েছিলাম। সকাল বেলা, যেটা ছিল রমজানের প্রথম দিন। আমরা ভাইদেরকে বললাম: আয়েশা তো ক্লান্ত। তারা বলল: আমরা শীঘ্রই তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে আসব। কিন্তু যে বাড়িতে আমরা অবস্থান করেছিলাম, সে বাড়ির লোকজন আমাদের সকলকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। কারণ তারা ভয়ে ছিল, পাছে তাদের ঘরে বোম্বিং হয়! আমরা দিনের দীর্ঘ সময় পাহাড়ের উপরে মহা সড়কে বসে থাকলাম। তারপর আমরা সেখানে একটি ঘর পেয়ে তাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে আয়েশাকে রাখলাম।

কিন্তু আকস্মিক উক্ত ঘরের মালিক মহিলা চেঁচিয়ে উঠে বলল: এ ঘর আমার। আপনারা বের হোন। আমরা তাকে বললাম: শুধু ছোট বাচ্চাদেরকে বসাই...। অগত্যা সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মত হল। যখন যোহরের সময় হল, আমরা পাহাড়ে চলতে চলতে অযুর পানির সন্ধান করলাম। একটি পানির নলকূপ পেয়ে গেলাম। আমরা সকলে সেখানে অযু করে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়লাম।

আসরের নামাযের পর ভাইয়েরা আসল আমাদেরকে ভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েকটি গাড়ি। তারা আমাদেরকে বলল: আপনারা প্রস্তুত হোন। সফর অনেক দীর্ঘ হবে।

তাই আমরা দ্বিতীয়বার নেমে অযু করে নিলাম। আমরা গাড়িতে উঠার সময় ভাইয়েরা বলল: আপনারা দ্রুত গাড়িতে উঠুন। আমরা তাদেরকে বললাম: ডক্টর আয়মানের কন্যা আয়েশা পাহাড়ের উপরে একটি কামরায় আছে। সে আহত, তাকে নিয়ে আসা জরুরী। তখন জনৈক ভাই বলল: আমি তাকে নিয়ে আসছি। আপনারা গাড়িতে আমার স্ত্রীর সাথে বসুন।

আমরা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাইটি একটু বিলম্ব করে ফিরে আসল। তার সাথে আয়েশা নেই। আমরা বিস্মিত হলাম। তার স্ত্রীকে বললাম: মেয়েটি আহত। তাকে আমাদের সাথে নিয়ে আসা জরুরী। সে কোথায়? তখন ভাইটি আমাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দিতে লাগল: আপনারা হলেন ধৈর্যশীল। আয়েশা ছোট্ট মেয়ে। সে গভীর আঘাতপ্রাপ্ত ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! সে তার মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে। তার জন্য মোবারকবাদ। আজ জুমার দিন, রমজানের প্রথম দিন। আমরা সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। সে ভাই আমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকল। তার স্ত্রীও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। রাস্তায় মাগরিবের আযান হল। আমরা কয়েকটি খেজুর ও পানি দিয়ে দিয়ে ইফতার করলাম। অতঃপর পূর্ণ পথ অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় একটি বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। গাড়িগুলো আমাদেরকে পাহাড়ের নিচে থামিয়ে দিল। আমরা পায়ে হেটে আরোহণ করতে লাগলাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে এই পাহাড় আরোহণ করা আমাদের জন্য খুব কষ্টকর ছিল। তাই সময়ও অনেক বেশি লেগেছিল।

আমরা যখন ঘরে পৌঁছলাম, তখন কার্পেট বিছানো, হিটার জ্বালানো একটি বড় কক্ষ পেলাম। তারা আমাদের জন্য খানা উপস্থিত করল। আমাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান করল। এ বাড়ির মালিক বলত: আমি, আমার পরিবার, আমার ঘর এবং আমি যত কিছুর মালিক, সব কিছু আপনাদের জন্য উৎসর্গিত। আমার ভাই শহীদ (যেমনটা আমরা তার ব্যাপারে ধারণা করি) উসামা রহিমাহুল্লাহ ১১ সেপ্টেম্বরের পর ব্রিটেন থেকে কান্দাহারে এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে দেখিনি। তিনি যখন ঘটনা জানতে পারলেন, তখন আমার নিকট এই বাড়িতে আসলেন। তিনদিন আমার সঙ্গে থাকলেন। তারপর, ভাইয়েরা সকল নারী ও শিশুদেরকে পাকিস্তানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই, আমরা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সফর ছিল দীর্ঘ ও কষ্টকর। পাকিস্তানী মুজাহিদগণ আমাদের সঙ্গ দিল। আমরা তাদের একজনের বাড়িতে অবস্থান নিলাম। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতিও ছিল খুব আশঙ্কাজনক ছিল। তাঁদের অনেক ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাই পাকিস্তানী ভাইয়েরা আমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করলেন। তাঁরা আমাদেরকে মরুভূমিতে তৃণ নির্মিত একটি কুঁড়েঘরের উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলেন। আমরা সেখানে অবস্থান করতে লাগলাম। সবকিছু জীবনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হল। ফলে, আরব ভাইয়েরা আমাদেরকে নেওয়ার জন্য একজনকে পাঠাল। তারপর আমরা ইরান সফর করলাম। সেখানে আমার ভাই উসামার সাথে সাক্ষাত হল। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন! তারপর ইরানে আমরা গ্রেফতার হলাম। দু'বছর পর আমরা সেখান থেকে পালিয়ে ওয়াযিরিস্থানে চলে আসলাম।

এ ঘটনার আরো বাকি আছে। কিন্তু আমি পাঠকদের সামনে আর দীর্ঘ করতে চাই না। মুজাহিদগণের জীবন অনেক ঘটনা ও বিপদাপদে ভরা। এর কোনো শেষ নেই, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করেন কিংবা তাঁরা শাহাদাত লাভ করেন। আমি আমাদের রবের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন, শাহাদাত দান করুন, আমাদেরকে কবুল করে নিন, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদেরকে ও আমাদের সকল মুসলিম বোনদেরকে বন্দীত্ব থেকে নিরাপত্তা দান করুন। আমীন।

পরিশেষে আমি আমার মুজাহিদা, মুহাজিরা ও মুরাবিতা মুসলিম বোনদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি বার্তা দিয়ে আমার কথা শেষ করব। আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি:

ধৈর্য, ধৈর্য। দৃঢ়তা, দৃঢ়তা। আমরা সকলেই যেন জেনে রাখি, বিজয় কেবল ধৈর্যের সঙ্গেই আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে কৃত্রিমভাবে ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। যে অমুখাপেক্ষী থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন। যে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দেন। আমি তোমাদের জন্য ধৈর্য থেকে ব্যাপক কোনো রিযিক দেখি না।"

তাই, হে আমার প্রিয় বোনেরা!
আল্লাহর পথে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ, আমাদেরকে জান্নাতে মহান আল্লাহর সঙ্গে এবং প্রিয় নবীজি মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর সঙ্গে সাক্ষাতে পৌঁছে দেবে ইনশাআল্লাহ। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ দ্বারা। আর জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ দ্বারা।"

আমাদের মহান রব বলেছেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, (কখনো) ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফসলহানী দ্বারা। যেসব লোক (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও। এরা হল, সেই সব লোক, যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে উঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব। এরা সেই সব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়াতের উপর।"
[সূরা বাকারাহ,২: ১৫৫- ১৫৭]

তাই, যে-ই মহান আল্লাহর পথে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত ও রহমতের সুসংবাদ রয়েছে। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ যুদ্ধ অনেক দীর্ঘ। এটা হল ঈমান ও কুফরের মধ্যে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে যুদ্ধ।

আমরা আমাদের সন্তানদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে দেই যে, পূর্ব-পশ্চিমের ইসলামের শত্রুরা আমাদের অনিষ্ট ব্যতীত কিছুই চায় না। তারা চায়, আমরা যেন আমাদের দ্বীন ছেড়ে দিয়ে তাদের অনুসরণ করি।

যতদিন আমরা আমাদের দ্বীন আঁকড়ে থাকব, ততদিন তারা কিছুতেই আমাদেরকে ছাড়বে না। তাই আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এ কথা আত্মস্থ করাব। তাদের হৃদয়ে আমেরিকা ও সেসকল কাফের ও পাপিষ্ঠ শাসকদের ব্যাপারে ঘৃণা বদ্ধমূল করে দিব - যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান দিয়ে শাসন পরিচালনা করে, মুসলিমদেরকে নির্যাতন করে এবং সম্পদ ছিনতাই করে।

পরিশেষে আমরা ঘোষণা করছি: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। আর আমাদের সরদার মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক! **(শেষ)**

যতদিন আমরা আমাদের দ্বীন আঁকড়ে থাকব, ততদিন তারা কিছুতেই আমাদেরকে ছাড়বে না। তাই আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এ কথা আত্মস্থ করাব।

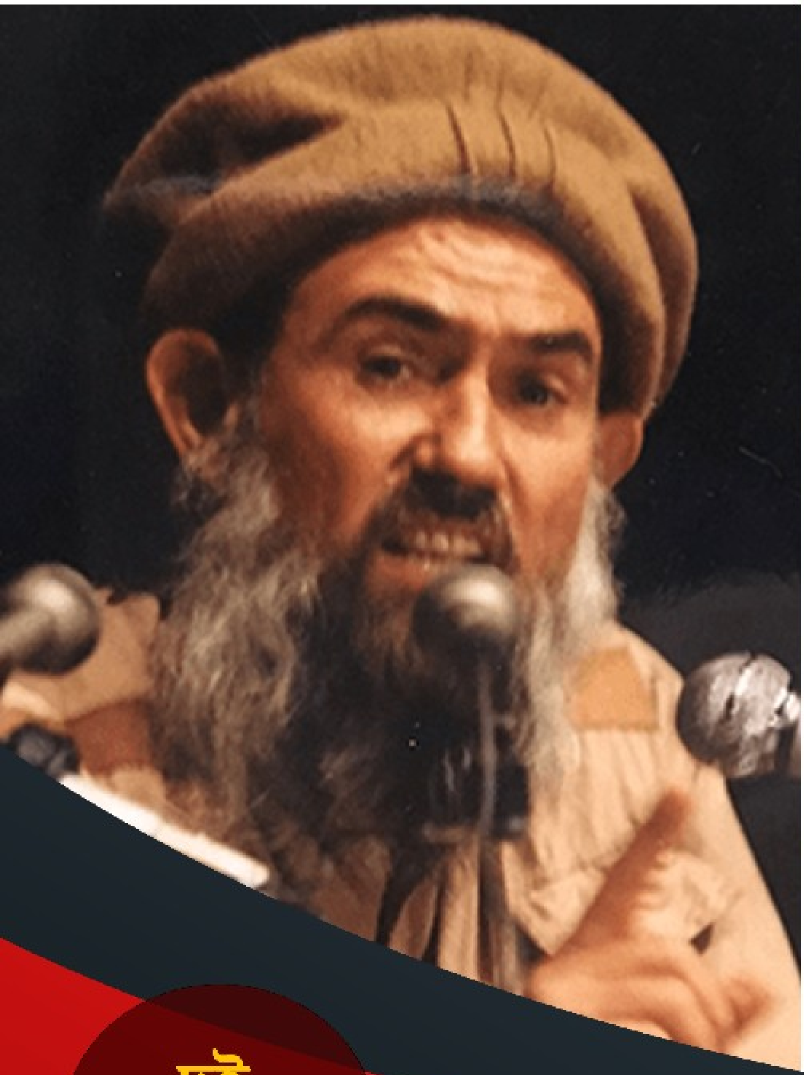

দুই মুজাদ্দিদ

উসামা বিন লাদেন ও আযযাম: পরস্পর সাংঘর্ষিক, নাকি ভিন্নধর্মী!

"আধুনিক জিহাদের দু'টি ধারা: বিন লাদেন ও আযযাম" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের উপর কিছু আপত্তি

দ্বিতীয় আসর: ইমাম আযযাম ও বিন লাদেন ইমামদ্বয়ের হত্যা ও তাকফীরের মাসআলাসমূহ

খাত্তাব বিন মুহাম্মদ আল-হাশিমী

পূর্ববর্তী আসরে আমি দুই শহীদ ইমাম- উসামা বিন লাদেন ও আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তাঁদের কিছু ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি, আকিদাগত অবস্থান এবং বিশেষ করে ইসলামিক কাজে তাঁদের সংস্কার ও আন্দোলনের রূপ-রেখা তুলে ধরেছিলাম। সেখানে আমি তাদের উভয়ের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, তাদের ফিকহী, আকিদাগত ও প্রশিক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এক। আর সংস্কার ও আন্দোলনের দিক থেকেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও সংস্কারের বিভিন্ন ধাপের আবশ্যকীয় কিছু কৌশল ভিন্ন ভিন্ন।

তবে তারা যেমনিভাবে ব্যক্তি হিসাবে ভিন্ন, তেমনি সৃষ্টিগত গঠন, জ্ঞান ও বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও ভিন্ন। যেমন আযযাম হলেন একজন আল্লাহ ওয়ালা আলেম, ফকীহ ও দাঈ। যিনি পথপ্রদর্শন, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেণা দান করতেন। আর বিন লাদেন হলেন একজন সামরিক কমাণ্ডার। আধুনিক জিহাদের একজন ধনবান অর্থায়নকারী। অর্থনীতি ও ম্যানেজমেন্টে বিশেষজ্ঞ।

আর উভয়েই নিজেদের জান, মাল, সময়, পরিশ্রম এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন আল্লাহর পথে বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা তাঁদের ব্যাপারে এমনটা ধারণা রাখি, কিন্ত আল্লাহর উপর কারো পরিশুদ্ধি বর্ণনা করি না।
অতঃপর সেখানে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, বিন লাদেন, শায়খ আযযামের দু'বছর আগে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। সেখানে ১৪০০ হিজরীতে আনসার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজ সাথীদের নিয়ে আফগান মুজাহিদগণের সাথে মিলে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে যুদ্ধে শরীক হন।

আর ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ প্রথমদিকে মনে করতেন, আরবদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাই উত্তম। তবে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও আফগান মুজাহিদগণের সাথে দলীয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শায়খ বিন লাদেন যে পদ্ধতিতে চেয়েছিলেন, তথা বিভিন্ন দলের মাঝে আরব মুজাহিদগণের একটি স্বতন্ত্র প্লাটফর্ম রাখা এবং আফগান মুজাহিদগণের পাশে তাঁদের জন্য আলাদা ক্যাম্প বানানো- সেভাবে নয়। উভয় ইমামের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন দিকের মাঝে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও শায়খ ইবনে লাদেন রহিমাহুল্লাহ,, শায়খ ফকীহ আযযামের মর্যাদার প্রতিও পরিপূর্ণ খেয়াল রাখতেন এবং মতপার্থক্যের শিষ্টাচারের ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন। একারণেই শায়খ ইবনে লাদেনের নেতৃত্বাধীন আনসার ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও তিনি শায়খ আযযামের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত সেবা প্রতিষ্ঠানেরও প্রধান অর্থায়নকারী ছিলেন।

শায়খ ইবনে লাদেন ও তাঁর সাথীগণ জাজির যুদ্ধগুলোতে সফলতা অর্জন করলেন। এবং আল্লাহর তাওফিকে তাঁরা আফগানিস্তানে রাশিয়ার স্পেশাল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তাঁদের বিরাট সংখ্যককে হত্যা করেন। অতঃপর শায়খ আযযামও যৌথ সামরিক কার্যক্রম এবং আরবদের পৃথক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সেই সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানগুলোতে অব্যাহত সামরিক সহযোগীতা করে যাওয়া, পেশওয়ারে মানবিক সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত নিলেন। ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই যামানায় জিহাদের ময়দানে এমন ত্যাগ, বিসর্জন ও কুরবানী পেশ করেছেন, যা অন্য কেউ করেনি। তিনি নিজে মুজাহিদগণের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ ও উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো অতিক্রম করতেন। ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ নিজে স্বশরীরে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই তিনি নিজের মাঝে ইলম এবং যবান ও অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদকে একত্রিত করেছিলেন। উপরন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াত ও মানুষকে তালিম দানের ক্ষেত্রেও তাঁর বিরাট মেহনত ছিল।

আমরা এই সাক্ষ্য দেই এবং বিশ্বাস করি যে, ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ মুসলিম জাতির জন্য এমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যা তাঁর যুগে অন্য কেউ করেনি। তিনি আমাদের যামানার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তুল্য ছিলেন। যদি আযযাম না হত, তাহলে হয়ত ইবনে লাদেনের পরিচয়ই শুনতে পেতাম না। এটি একটি সত্য সাক্ষ্য, যেটা আমরা আল্লাহর জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য এবং সত্য ইতিহাসের জন্য বলছি। কেউ এই বাস্তবতা লুকাতে চাইলে আমরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না।

আল্লাহ তায়ালা ইমাম আযযাম এবং তাঁর উত্তরসূরী ও ছাত্র ইমাম ইবনে লাদেনের প্রতি রহম করুন। এ আলোচনার মাধ্যমে পাঠকের নিকট সেই ঐতিহাসিক ভুলটি স্পষ্ট হয়ে যাবে, যা "আধুনিক জিহাদের দু'টি ধারা: ইবনে লাদেন ও আযযাম" নামক প্রবন্ধের লেখক তার নিম্নোক্ত বক্তব্যে কতিপয় লোকের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন:

"কেউ কেউ মনে করেন যে, জিহাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জিহাদের ক্ষেত্রে ইবনে লাদেন ও আলকায়েদার নীতিমালা মূলত আব্দুল্লাহ আযযামের দৃষ্টিভঙ্গিরই ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক বিকাশ। কিন্তু অন্যরা মনে করেন, উভয় ধারার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির মাঝে বিস্তর ব্যবধান। উভয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত, পরস্পরের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।"

সঠিক কথা হল, জাজির যুদ্ধগুলোতে সফলতা লাভ করার পর ইমাম আযযামের পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি, যেটাকে লেখক জিহাদুল মুনাসারাহ (সহযোগীতামূলক জিহাদ) বলে অভিহিত করেছেন- তা পরিবর্তিত হয়ে তার শিষ্য ইবনে লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপ নেয়, যেটাকে ওই লেখক জিহাদুল মুহাজারাহ (হিজরতের জিহাদ) বলে অভিহিত করেন। আল্লাহ উভয় শায়খকে কবুল করুন!

অবশেষে যে কর্মপদ্ধতির উপর উভয় ইমামের মত স্থির হয়, তা হল, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল আন্তর্জাতিক কুফরী প্রভাব থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য সমস্ত মুসলিম জাতিকে সামরিক বানাতে হবে।

উভয় শহীদ ইমামই সেই নিম্নমুখী দাওয়াতের তীব্র নিন্দা করতেন, যা কতিপয় আত্মসমর্পণবাদী ও 'হস্ত সংবরণ করো" শ্লোগান উঁচুকারী জামাত দিয়ে থাকে, যার উদ্দেশ্য হল মুসলিম জাতিকে কাফেরদের পোষ্য বানানো এবং তাদের অন্তরে অস্ত্র ধারণ ও ইসলামী আত্মমর্যাদায় জ্বলে উঠার সংকল্প নষ্ট করে দেওয়া। বরং তাঁরা মানুষকে উৎসাহ দিতেন ইজ্জতকে আদর্শ বানাতে এবং মর্যাদাকে ধর্ম বানাতে। পক্ষান্তরে "হস্ত সংবরণ করো" শ্লোগানের প্রবক্তাদের অবস্থা বুঝার জন্য বুদ্ধিমান লোকেদের এ বিষয়টি চিন্তা করাই যথেষ্ট যে, তারা যেকোনো সামরিক বিপ্লবের আওয়ায শোনার সাথে সাথেই অবচেতনভাবে বিবেক ও প্রকৃতির ভাষণের দিকে ফিরে যায়। তখন তাদের চিন্তা থেকে দেশীয় সহমর্মিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাগুলো একেবারে উড়ে যায়। তখন তাদের ঘোষকরা জিহাদ ফরজ হওয়ার, দেশ রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করার এবং যাদেরকে এক সময় দেশীয় সেনাবাহিনী বলে আখ্যা দিত, তাদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং যাদেরকে এক সময় দ্বীনী ভাই ও দেশীয় ভাই বলত তাদেরই রক্তপাত করার আহ্বান করতে থাকে। আমরা এমনটাই দেখেছি সর্বশেষ তুর্কি বিদ্রোহের সময়। বর্তমানেও দেখছি হতভাগা হাফতার বাহিনীর লিবিয়ায় প্রবেশ করার ব্যাপারে। আর ইতিহাস ভবিষ্যতেও প্রতিটি গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় তাদের মত লোকদের এহেন অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে।

অতঃপর আমি জিহাদ, রাজনীতি, হত্যা ও তাকফীরের মাসআলাগুলোতে ইমাম আযযামের নীতি-আদর্শ আলোচনার মাধ্যমে আমার প্রবন্ধটির ইতি টেনেছি। সেখানে আমি আধুনিক উদ্দেশ্যবাদীদের বক্র আদর্শও স্পষ্ট করে তুলেছি।

এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গত করা সমস্যা মনে করি না, তা হল: ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত লোকদের কুফরী জনসম্মুখে সুস্পভাবে বলার বিষয়টি নির্ভর করে জনসম্মুখে তাদের তাকফীরের কথাটি বলা ও প্রচার করা দ্বারা কী উপকার বা অপকার হবে তার উপর। তবে শর্ত হল, আল্লাহর জন্য মানুষের মাঝে সত্য কথা উচ্চারণকারী লোক থাকতে হবে এবং অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এ সকল লোকদের কাফের হওয়া ও ইসলাম থেকে বের হওয়ার বিশ্বাসও রাখতে হবে। তা না করে উল্টো তাদের তোষামোদ করা, মানুষকে তাদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার আহ্বান করা বা সুস্পভাবে তাদেরকে ইসলামের রক্ষক ও আমির বলা এবং তাদের কথা শোনা ও মানাকে ফরজ সাব্যস্ত করা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হচ্ছে: এ সকল তাগুতদের কুফরী জনম্মুখে বলার মাঝে এত এত দ্বীনী স্বার্থ রয়েছে, যার মাধ্যমে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত অনেক শরয়ী উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। জিহাদকারীগণ ও রণাঙ্গনের উলামাগণ শরীয়তের উদ্দেশ্য ও রহস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণা

করার বিরোধিতা করেন না। তাঁরা প্রগতিশীল উদ্দেশ্যবাদীদের যে বিষয়টির সমালোচনা করেন, তা হল: ফিকহী উদ্দেশ্যসমূহ হতে সাদৃশ্যপূর্ণ ও অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে ইবাদতের মূল বস্তু বানানো। বিশেষ করে যে সকল কথিত উদ্দেশ্যগুলো সামাজিক ফিকহী আহকামগুলোকে অকার্যকর ও বাতিল করে দেয়। অতঃপর সেগুলোকে শরীয়তের সুস্পষ্ট মুহকাম দলিলগুলোর সাংঘর্ষিক বানানো এবং শরীয়তের উদ্দেশ্যের কথা বলে ফিকহ ও ফিকহের কিতাব সমূহ থেকে বহু দূরে চলে যাওয়া। আর উদ্দেশ্যগুলোকে কোনো সুউচ্চ প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া এবং একথা বলা যে, চার মাযহাব থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসা ফিকহও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

একারনে ইমাম আযযাম, ইবনে লাদেন ও তাদের অনুসারীগণ শরীয়তের উদ্দেশ্যবালীর আলোচনাকে একেবারে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁরা, স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিলসমূহ ও পূর্ববর্তী ফুকাহাগণের সংকলিত ফিকহ বাদ দিয়ে শুধু উদ্দেশ্যগুলোকেই বিধি-বিধানের ভিত্তি বানানোর বিরোধিতা করেন। আর এটাকে আমরা মনে করি, ফিকহের হাকিত ও মূল প্রাণ থেকেই বিচ্যুতি।

এটা ইসলামের সুস্পষ্ট ফিকহকে বিকৃতি সাধণ ও ধ্বংস করা। প্রকৃতপক্ষে তারা যে আধুনিক ও সমসাময়িক ফিকহের কথা বলে থাকে, তাদের কাজ তা থেকে বহু দূরে।

আসলে এই প্রগতিশীল উদ্দেশ্যবাদীরা কথিত উদ্দেশ্য অনুসন্ধানী ফিকহ ও এর মাধ্যমে অকাট্য বিধানগুলোকে অস্পষ্ট করার দিকে তখনই মনোনিবেশ করেছে, যখন দেখেছে যে, পূর্ববর্তী ইমামগণ ফিকহের শাখাগত মাসআলাগুলোরও বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি বলে গেছেন। এবং তা বুঝার পদ্ধতি, উদঘাটনের নীতিমালা এবং কিয়াস ও কারণ নির্ণয়ের সূত্রসমূহও বলে গেছেন। উপরন্তু তারা শরীয়তের উদ্দেশ্য ও উৎস বুঝার ক্ষেত্রেও গভীরে পৌঁছেছিলেন।

যাইহোক, আমি এখন যা কিছু লিখলাম, তা একমাত্র ওই সকল লোকদের সংশয় দূর করার জন্য, যারা জিহাদী শায়খ ও উলামাদেরকে এই অপবাদ দেয় যে, তাঁরা উম্মতকে জাগিয়ে তোলার জন্য যে স্বশস্ত্র ও জিহাদী আন্দোলন করছেন, তাতে শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেননি। এবং তাঁরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ। এখন আমি "কালিমাতু হক" পত্রিকার লেখকের প্রবন্ধগুলোর ব্যাপারে আপত্তিমূলক আলোচনার দ্বিতীয় আসরে পুর্বোল্লেখিত বিষয়টি, অর্থাৎ উভয় ইমামের ফিকহী ও প্রশিক্ষণ মূলক নীতিমালা যে এক ও অভিন্ন ছিল, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে শত্রুর আগ্রাসনের মুহূর্তে, সে আলোচনাটি পূর্ণ করব ইনশা আল্লাহ। আর উক্ত লেখক তাদের মাঝে যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারেও আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। কিন্তু আমি একটি নীতিগত ও যৌক্তিক বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। তা হল ওই লেখকের উপস্থাপনাটি কোনো মানসম্পন্ন সমাধানমূলক আলোচনা বা স্বার্থক শাস্ত্রীয় গবেষণা থেকে বহু দূরে। লেখকের যে বক্তব্যটি আমার বিস্ময় সৃষ্টি করেছে তা হল, লেখক বলেছে:

সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অচিরেই কোনো গুণগত ও নির্ভরযোগ্য গবেষণার কাছে এই গবেষণাটি ম্লান হয়ে যাবে। এখানে আমি ওই সকল বিশ্লেষণের দিকে যাইনি, যেগুলোর এখানে সুযোগ নেই।

তাই, বিশুদ্ধ গুণগত গবেষণা ও সুস্থ নির্ভরযোগ্য বিতর্ক এটাই বলে যে, এ দুই ব্যক্তির মাঝে সঠিক তুলনা তখনই হবে, যখন উভয়ের অবস্থা, পরিস্থিতি, কাল ও কাজের স্থান এক হবে। এটা হবে একমাত্র ১৪০৯ হিজরী পর্যন্ত উভয়ের ভিন্নতা ও একতার স্থানগুলো নিয়ে গবেষণা করলে, কিন্তু উক্ত লেখকের গবেষণা ও প্রবন্ধটি এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হলে এই কাল, স্থান ও অবস্থার ভিত্তিতেই সঠিক তুলনা করা সম্ভব। যেখানে উভয় ইমাম একজন অপরজনের সঙ্গে কাজ করেছেন। পক্ষান্তরে, এমন ঘটনাবলীতে তুলনা করা, যেগুলোতে একজন উপস্থিত ছিলেন না, আবার পূর্বের তুলনায় সময়, স্থান, যুদ্ধের বিস্তৃতি এবং যুদ্ধ-পরিস্থিতির ক্রমবিকাশের বিশাল ও গ্রহণযোগ্য পার্থক্যও আছে, সেখানে এই তুলনা করা গাছ থেকে কাঁটা পাড়ার মত।

আপনি আরো আশ্চর্য হতে পারেন উক্ত লেখক এবং অনুরূপ অন্যান্য লেখকদের এই দৃঢ় বক্তব্য দেখে যে: ইবনে লাদেন যে পথে চলেছেন, তথা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আমেরিকা, ইহুদী ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া এবং তাদেরকে হত্যার আহ্বান করা, এ পথে আব্দুল্লাহ আযযাম কিছুতেই চলতেন না। এবং তিনি কিছুতেই বিমান ছিনতাই করা এবং বড় বড় টাওয়ার, দূতাবাস ও এজাতীয় স্থাপনাগুলোর উপর বোমা হামলা করার নীতি গ্রহণ করতেন না। সম্ভবত এই লেখকের (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন!) এই ওযর ছিল যে, সে ইমাম আযযামের শাহাদাতের দু'বছর পূর্বে তাঁর যে চিন্তাগত অভিমত ও আন্দোলনের নীতিমালা প্রকাশিত হয়েছিল, সেটার ব্যাপারে অবগত হয়নি। এ সকল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কেউ প্রকাশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম শায়খই প্রকাশ করেছিলেন। কেউ তাঁর সর্বশেষ অডিও ও ভিডিও বয়ানগুলো শুনলেই সুস্পষ্ট ও পরিস্কারভাবে দেখতে পাবেন যে, তিনি তাঁর জিহাদী ভাষণগুলোতে কতটা নতুনত্ব এনেছিলেন। যার মাঝে তিনি বর্তমান ইসলামের যুদ্ধের হাকিকত ও তার দাবিসমূহ স্পষ্ট করেন। এবং সেই গভীর সংকটের কথা পরিস্কার করে বলেন, যার মাঝে মুসলিম জাতি এখন বসবাস করছে, তথা উম্মতের বর্তমান ও ভবিষ্যত বাস্তবতা বুঝার অভাব। যে-ই তার সর্বশেষ শিক্ষা আসর ও ভাষণগুলো শুনবে বা মনোযোগসহ তাতে কান লাগাবে, তার সামনেই এটা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

একারণেই এবং এ সকল বিষয়গুলোর জন্যই ইহুদী ও ক্রুসেডাররা ইমাম আযযামের ভাষণগুলো বিকশিত হওয়ার ভয়াবহতা এবং উম্মতের অন্তরে তার গভীর প্রভাব পড়ার অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। তাই ইহুদী ও ক্রুসেডাররা তাদের আরব কর্মচারীদেরকে, ইমাম আযযামকে গুপ্তহত্যা করার প্রয়োজনীয়তা বুঝালো।

যেন আফগানিস্তান থেকে সেভিয়েত ইউনিয়নের অপসারণ ও লাল ভাল্লুকদের বের হয়ে যাওয়ার পর তার পেশকৃত চিন্তা-ভাবনাগুলো উম্মতে মুসলিমার আরেকটি সংস্কারমূলক জিহাদী আন্দোলনে রূপ না নেয়। শত্রুরা যা চেয়েছিল তা পূর্ণও হল। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ শহীদ হলেন। কিন্তু আল্লাহ ইমাম্ আযযামের প্রতিনিধিত্বকারী তাঁর একজন যোগ্য উত্তরসূরীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেই উত্তরসূরীই ছিলেন উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ। উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, ইমাম্ আযযাম রহিমাহুল্লাহ যত সংস্কারমূলক, জিহাদী ও দাওয়াতী চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছিলেন, সবগুলো কার্যগতভাবে বাস্তবায়ন করেন। তাই নব্বইয়ের দশক থেকে বিন লাদেনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক জিহাদের ভার্শনটি হল ইমাম আব্দুল্লাহ আযযামের মাযহাবেরই আমলী বাস্তবায়ন।

এ কারণে উক্ত লেখক বা কারো জন্যই যৌক্তিকভাবে ঠিক হবে না, ইবনে লাদেন ও ইমাম আযযামের মধ্যকার সে সকল ভিন্নতাগুলোকে মাপকাঠি বানানো, যেগুলো ইমাম আযযামের শাহাদাত বরণের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ও লড়াইয়ের বিকাশের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিকভাবে ঠিক নয়। কারণ মানুষ নিজস্ব পরিস্থিতি ও সে সময় যে সকল নতুন কারণ, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য দেখা দেয় তার আলোকেই কাজ করতে বাধ্য।

চতুর্থ আপত্তি:

বর্তমানে মানুষের মন-মানষিকতায় তাকফীরের মূলনীতি স্থির করা আর তাকফীরের হুকুম প্রয়োগ করা- দু'টি বিষয় এক হয়ে গেছে মর্মে অভিযোগ-

লেখক (আল্লাহ তাকে তার পছন্দনীয় ও প্রিয় কাজ করার তাওফিক দান করুন!) বলেছে:

আব্দুল্লাহ আযযামের (যিনি জামে আযহার থেকে উসূলে ফিকহ এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন) ছিল শাস্ত্রীয় মন-মানষিকতা। অর্থাৎ তিনি বিধি-বিধান উদঘাটনের বিভিন্ন পন্থা ও নীতিমালা এবং তা থেকে যত শাখাগত মাসআলা বের হয়, যেগুলো গ্রহণযোগ্য সুন্নী মাযহাবসমূহের ইখতিলাফের বিস্তৃত গণ্ডির ভিতরে পড়ে, তা জানতেন। আর নিঃসন্দেহে রাজনীতি এবং যুদ্ধ-জিহাদ সম্পর্কেও অনেক মাসআলা আছে। এজন্যই আপনি দেখতে পাবেন, তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দল বা সংগঠনের অনুগত ব্যক্তিদের উপর ব্যাপকভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপ করতেন না। বরং ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন। বিশেষ করে তাকফীর ও হত্যার মাসআলাগুলোতে। যেগুলো ইবনে লাদেনের নিকট লক্ষণীয় ছিল না।

বরং অনেক সময় তাঁর থেকে তার বিপরীতই প্রকাশ পেত। তাই তাঁর থেকে দেখতে পাবেন বিরোধী দলসমূহের সমষ্টির উপর ঢালাওভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপ করার প্রবণতা। যাদের মাঝে আছে সে সকল ইসলামিক লোকগণও, যারা জাহিলী শাসনব্যবস্থার পার্লামেন্টে বা মন্ত্রণালয়ে বা তার কোন মৈত্রী চুক্তিতে যুক্ত হয়। আর এর মূল কারণ হল ওহাবী ফিকহী মন-মানসিকতার প্রভাব। যারা সাদৃশ্যপূর্ণ বাহ্যিক অবস্থা এবং দ্ব্যর্থবোধক কারণসমূহের ভিত্তিতে হুকুম আরোপ করে থাকে, অন্তর্নিহিত হেতু, পূর্বাপর অবস্থা এবং কাজের সম্পর্কের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে না।

লেখকের উল্লেখিত বক্তব্যে কতগুলো মাসআলায় সুস্পষ্ট সংমিশ্রণ, তাকফীর ও হত্যার মাসআলাগুলোতে উভয় ইমামের নীতির মাঝে অন্যায় পার্থক্য, শায়খ উসামার দ্বীনদারীর উপর প্রকাশ্য আক্রমণ এবং ইমাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ এর প্রতিষ্ঠিত ফিকহী ধারার উপর বে-ইনসাফী সমালোচনা হয়েছে। প্রথমত: তাকফীর ও হত্যার মাসআলায় শায়খ আযযামের নীতির ব্যাপারে এবং তিনি নাকি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দল ও সংগঠনের অনুগত ব্যক্তিদের উপর ব্যাপকভাবে তাকফীর করা থেকে দূরে থাকতেন এবং ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন, এটা অনেক বড় ভুল। কারণ শায়খের লিখনী ও অডিও বক্তব্যগুলো এখনো বিদ্যমান। শায়খ ব্যাপকভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপ করেছেন এবং মুসলিম দেশসমূহের অনেক শাসকদের রক্তপাতকে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এমনিভাবে সরকারের সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের অনুগত ব্যক্তিদের উপরও ব্যাপকভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপ করেছেন। যেমন লিবিয়ার গাদ্দাফী সরকার, সিরিয়ার হাফিজ আসাদ সরকার, মিশরের আব্দুন নাসের সরকার এবং সেভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য কাফের গোষ্ঠীর সাথে মিত্রতকারী আফগানিস্তানের নজীব সরকার। শুধু তাই নয়, যারাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে বা সাহায্য আদান-প্রদান করে, এমনকি যদি তারা সাধারণ মুসলিমও হয়- তাদের সকলের উপর ব্যাপকভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপ করেছেন। যেমন শায়খ রহিমাহুল্লাহ এক ভাষণে বলেন: আমাদেরকে এ হুকুমটি জানতে হবে যে, যে-ই আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব করে সে কাফের। যে ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব করে সে ইহুদী। যে খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করে সে খৃষ্টান। ومن يتولهم منكم فإنه منهم "তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই একজন।"

শায়খ রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন: কোনো প্রশ্নকারী প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের জন্য কি এমন কোন পুলিশকে হত্যা করা জায়েয হবে, যে নামায রোজা পালন করে, একারণে যে, সে আমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে?

শুনুন, এক্ষেত্রে ফুকাহাদের সর্বসম্মত রায় হল, কোনো মানুষের জন্য এমন কারো নিকট আত্মসমর্পণ করা জায়েয নেই, যে তার সম্মান নষ্ট করতে চাচ্ছে। আব্দুন নাসের একজন মুসলিম ভাইকে ২০ বছরের জন্য কারাগারে নিয়ে যাবে। এবং পুলিশ তার স্ত্রীর নিকট এসে তার সামনে তার স্ত্রীর সম্মান নষ্ট করবে। তাই এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, কোনো মুসলিমের জন্য কিছুতেই আত্মসমর্পণ করা জায়েয নেই, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন যে, ইজ্জতের উপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা সর্বসম্মত ফরজ। তাই আপনি একজন পুলিশকে রাতের আঁধারে আপনার ঘরে প্রবেশ করতে দিলেন। আপনার স্ত্রী ঘুমের পোষাকে উন্মুক্ত হয়ে আছে। তখন তারা তার পর্দা উন্মোচিত করবে এবং আপনাকে অনুসন্ধান করে দেখবে যে, আপনি তার নিকট ঘুমিয়ে আছেন। এতে আপনার সম্মানহানী হবে। আপনি রাব্বুল আলামিনের নিকট গুনাহগার হবেন। তাই এটা জুলুম। আর পুলিশের নামায, রোজা তাকে হত্যার জন্য বাঁধা হবে না। তিনি আরো বলেন: এই শরয়ী হুকুমটির ব্যাপারে অজ্ঞতার বলি হয়েছে কত মুসলিম....। কারণ সরকারী সোর্স মধ্যরাতে তার স্ত্রীকে নিয়ে যেত। কিন্তু সে একজন মুসলিমের রক্তপাতের ভয়ে তাকে হত্যা করত না।

আর যুদ্ধ ও আকস্মিক আক্রমণের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে যা বলেন: শায়খ আযযাম তাঁর "মুহাম্মদ বিন মাসলামার তালিকা" নামক ভাষণে মুজাহিদগণকে ঐ সকল নামগুলোর তালিকা করতে বলেছিলেন, যাদেরকে আক্রমণ ও হত্যা করা ফরজ ছিল। উক্ত ভাষণে তিনি যাদেরকে এ তালিকায়

অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক, তাদের ব্যাপারে বলেন: আমরা সর্বপ্রথম এতে অন্তর্ভুক্ত করব প্রত্যেক এমন ইহুদীকে, যে ইসরাঈলকে সমর্থন ও সাহায্য করে বা তাদের প্রতি সহানুভূতি রাখে। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব কুফরের লিডারদেরকে এবং মানুষের উপর নির্যাতনকারী রাশিয়ান ও কমিউনিষ্ট নিকৃষ্টদেরকে। এর মাঝে আরো অন্তর্ভুক্ত করব সে সকল ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলসূহের লিডারদেরকে, যে দলগুলো গর্বের সাথে ধর্মদ্রোহিতা করে। এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করব এমন প্রত্যেক লোককে, যারা ইহুদীদের সাথে অবস্থান গ্রহণের ঘোষণা দেয়। চাই তারা পৃথিবীর যে দেশের বা যে ভূ-খণ্ডেরই হোক না কেনো।

তিনি আরো বলেন: আমাদের সকলের জানা উচিত যে, আমরা জহির শাহকে কাফের আখ্যায়িত করি, এমন কুফরের কারণে, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এমনিভাবে আমরা বাবরাক কার্মালকে কাফের আখ্যায়িত করি, এমন কুফরের কারণে, যা তাকে ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এটা আপনাদের মস্তিস্কে বদ্ধমূল হতে হবে। আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হতে হবে। আপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত হতে হবে।

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ, আব্দুন নাসেরের ব্যাপারে বলেন: সে কাফের ও মুশরিক হয়ে মারা গেছে। কেননা সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করেছে, যখন সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ভিন্ন বিধান দিয়ে শাসন করত। তিনি তাকে তাগুত বলে অভিহিত করেন, আল্লাহর ভালোবাসার সাথে যার ভালোবাসা কোনো মুমিনের অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন যে, প্রতিটি মুমিনকে অবশ্যই আব্দুন নাসেরের মত তাগুতকে কাফের আখ্যায়িত করতে হবে।

আর তাকফীরের বিধান আরোপ ও তাগুতদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে শায়খের বর্ণনার কোন সীমা নেই।এমনিভাবে ওই সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুগত ব্যক্তিদের উপরও ব্যাপকভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপের অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, যে সরকারগুলো কর্মগত বা বিশ্বাসগত ঈমান ভঙ্গের কারণসমুহে লিপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দলসূহের সদসদ্যদের উপরও। আর শায়খের বক্তব্যগুলোতে আমরা যেমনটা দেখলাম যে, তিনি ব্যাখ্যারও আশ্রয় নেননি, যেমনটা এই লেখক দাবি করেছে। (আল্লাহ তাকে মাফ করুন)। প্রথম আসরে রাশিয়ান যোদ্ধাদের সাথে সহযোগীতাকারী ব্যক্তিদের উপর তাকফীরের হুকুম আরোপ ও তাদেরকে হত্যার বৈধতার ব্যাপারেও শায়খ আযযাম থেকে বর্ণনা পেশ করেছি। এমনকি এরূপ নারীদের ব্যাপারেও। এমনিভাবে যে-ই এটা করবে এমন প্রত্যেকের উপর মুরতাদ ও যিন্দিক হওয়ার হুকুম আরোপ করেছেন শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ। জনৈক ব্যক্তি আফগান সরকারের সামরিক বাহিনীর অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে ফাতওয়া চাইলে তিনি বলেন:

আর আফগান বাহিনীর পক্ষ থেকে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ, সব সময় তাদের রক্ত হেফাজত করতে পারবে না। কারণ তারা তো আসলি কাফের নয়। বরং তাদের সাথে মুরতাদ ও যিন্দিকদের মুআমালা করা হবে।

আর শায়খ উসামার ব্যাপারে উক্ত লেখক যে অন্যায় আক্রমণ করেছে, তা তার নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

তাই তার থেকে দেখতে পাবেন বিরোধী দলসমূহের সমষ্টির উপর ঢালাওভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপ করার প্রবণতা। যাদের মাঝে আছে সে সকল ইসলামিক লোকগণও, যারা জাহিলী শাসনব্যবস্থার পার্লামেন্টে বা মন্ত্রণালয়ে বা তার কোন মৈত্রী চুক্তিতে যুক্ত হয়।

অথচ শায়খ উসামা ছিলেন, হুবহু শায়খ আযযামের মত। পূর্বে শায়খ আযযামের যেমন মত উল্লেখ করা হয়েছে, হুবহু তাঁর মত ছিল শায়খ উসামার। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ, আসলি কাফের, যেমন্ ইহুদী-খৃষ্টান ও যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে তাদের সমষ্টির উপর তাকফীরের হুকুম আরোপ করেন। আর ওই লেখক যেমনটা বলেছে- "যাদের মাঝে আছে সে সকল ইসলামিক লোকগণও, যারা জাহিলী শাসনব্যবস্থার পার্লামেন্টে বা মন্ত্রণালয়ে বা তার কোন মৈত্রী চুক্তিতে যুক্ত হয়।" কখনো এমনটা নয়।

কারণ শায়খ উসামা তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করতেন না, যেমন ছিলেন শায়খ আযযাম। তিনি তাদের উপর ব্যাপকভাবে তাকফীরের বিধান আরোপ করতেন না, যেমনটা এই লেখক তাঁর উপর অপবাদ আরোপ করেছেন। যদিও তিনি মনে করতেন, এদের কেউ কেউ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বশত: বা অজ্ঞতা হেতু শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। আর তারা শিরকী কর্মকাণ্ডে পতিত হয়েছে প্রমাণ করা আর তাদের উপর কুফরের হুকুম আরোপ করার মাঝে পার্থক্য আছে, যেমনিভাবে অনির্দিষ্টভাবে তাকফীর আর নির্দিষ্টভাবে তাকফীরের মাঝে পার্থক্য আছে। প্রথমটা দ্বিতীয়টাকে আবশ্যক করে না।

কিন্তু লেখক (আল্লাহ তাকে সুপথ প্রদর্শন করুন) উভয়টাকে একত্রিত করে ফেলেছে এবং শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করেছে। আমি জানি না এটা কি ঈমানের মাসআলাসমূহে লেখকের অস্পষ্টতা ও সংশয়ের কারণে, নাকি খোলসের আড়ালে অন্য কিছু। একই প্রবন্ধে বিভিন্নরূপ কথা বলা এটারই ইঙ্গিত দেয় যে, বিষয়টি সুচিন্তিত। উক্ত প্রবন্ধের বিভিন্ন সংস্করণেই শব্দের ভিন্নতা দেখা যায়। 'আলমা'হাদুল মিসরী লিদ-দিরাসাত' ও 'মুনতাদাল উলামা' যা ছেপেছে তাতে অনেক অতিরিক্ত কথা ও পরিবর্তন আছে, যা 'কালিমাতু হক' পত্রিকা যা ছেপেছে তাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই অপবাদ ও তুহমত ছিল সকল সংস্করণে।

আর যে সত্যটিকে সত্য হিসাবে প্রমাণ করা জরুরী, তা হচ্ছে, পার্লামেন্টে বা বিরোধী দলে বা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের হুকুমের ব্যাপারে শায়খ উসামা যা বলেছেন, তা মহান আল্লাহর তাওহিদের হক রক্ষা করার অন্তর্ভূক্ত, যা বান্দার উপর আল্লাহর হক। আর শিরকী ও কুফরী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্কীকরণ, কঠোরতাকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কিতাব, সুন্নাহ ও উম্মাতের পূর্বসূরীদের নীতি এটাই ছিল। একারণে শায়খ উসামা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ সজাগ ছিলেন। তিনি উম্মতের প্রতি দয়াশীল হয়ে, তাদের কল্যাণ কামনা করে, সৎ কাজের আদেশ করত: ও অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করত: ঈমান ও তাওহিদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামগণের নীতি অনুযায়ী এ মাসআলাগুলোতে কঠোরতা আরোপ করতেন ও মূলনীতি বলে দিতেন। যেকোন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আলেম, শায়খ রহিমাহুল্লাহ এর এ কথাগুলোকে এবং তাঁর পূর্ববর্তী উলামায়ে উম্মতের এ সংক্রান্ত কথাগুলোকে এ অর্থেই প্রয়োগ করেন।একারণে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ, ইরাকের ব্যাপারে যে বক্তব্যটি প্রদান করেছেন, তা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উপর কুফরের হুকুম আরোপ নয়, যেমনটা উক্ত লেখক দাবি করেছে।

শায়খ রহিমাহুল্লাহর বক্তব্যটি ছিল: নিশ্চয়ই যে-ই স্বেচ্ছায় ও জেনে শুনে এ সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, যার স্বরূপ ইতিপূর্বেই উম্মোচিত হয়েছে, সে আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফরী করল।

বরং এটা কুফরের মূলনীতি বর্ণনা। কুফরের হুকুম আরোপ নয়। এটা উম্মতকে পথপ্রদর্শন ও কল্যাণ কামনা এবং মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের অন্তরে ঈমান ও তাওহিদের মাসআলাগুলোর বড়ত্ব সৃষ্টি করা। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এমনভাবে জীবন যাপন করে গেছেন যে, তিনি বান্দার হকের চেয়ে আল্লাহর হককে অগ্রগণ্য মনে করতেন। তাই,উম্মতের কল্যাণ কামনা করে ও তাদের প্রতি দরদী হয়ে তিনি এই হক রক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। একারণে আমি মনে করি, উক্ত লেখক তার প্রবন্ধে 'আলমা'হাদুল মিসরী লিদ-দিরাসাত' এর সংস্করণে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে যে কথাটি বলেছে-

"তার নিকট পূর্বোক্ত সকল মাসআলাগুলোই অকাট্য আকিদার অন্তর্ভূক্ত, যেগুলোতে মতবিরোধের অবকাশ নেই এবং এগুলোতে কারো ওযরও গৃহিত হবে না।"

এটাও তার উপর আরোপিত অপবাদ। কারণ, শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ যদিও এ সকল মাসআলাগুলোকে অকাট্য আকিদার অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন, যেগুলোতে কারো মতবিরোধ গৃহীত হয় না, কিন্তু তিনি আহলে ইলমদের মধ্যে যারা তাবিল (ব্যাখ্যা) করে এ মত পোষণ করতেন, তাদের ওযর গ্রহণ করতেন। বিশেষ করে যদি উক্ত আলেমের দ্বীনদারি ও উত্তম চরিত্র উম্মতের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়।

আর এসকল মাসআলার ব্যাপারে অজ্ঞ সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে যারাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত, তিনি তাদের সকলকেও কাফের আখ্যা দিতেন না। আর এমন কিছু ব্যক্তি থাকে যারা শিরকী পার্লামেন্টে ও প্রতিনিধি সভার অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু তারা দুর্নীতি ও জুলুম কমানোর চেষ্টায় তাদের দায়িত্ব আদায় করে । সর্বদা শরীয়ত বিরোধী শিরকী কানুনসমূহের বিরোধিতা করে যা সকলের সামনে প্রকাশ্যও। অপরদিকে তারা নিজেরা পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়তের ভিতরে থাকে এবং ইসলামের দুশমনদের দালালী করা থেকে পরিপূর্ণ দূরে থাকে। এরূপ ব্যক্তিদের উপর শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহকে তাকফীরের বিধান আরোপ করতেন না।

শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ এ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা জায়েয হওয়ার ব্যাপারেও শায়খ আযযামের মত ও ইজতিহাদের উপরই চলেছেন। এমনকি শায়খ আযযামকে সহযোগিতাও করেছেন এবং শায়খ আযযামের প্রতিষ্ঠিত সেবা সংস্থা সফলের জন্য নিজের জান ও মাল ব্যয় করেছেন। এবং শায়খের শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত সাত বছর তার সাথে ইসলামী কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

শায়খ উসামা, তাঁর শায়খ আযযামের সাথে কিছু শাখাগত ফিকহী ও আকিদার মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও তাঁকে পরিপূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। আর এর বিপরীতে শায়খ আযযামও সর্বদা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন, তাঁর জন্য দু'আ করতেন। যেহেতু, তিনি শায়খ উসামার মাঝে ইখলাস, উত্তম চরিত্র ও মধ্যপন্থী আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্য সকল আহলে ইলমদের সাথেও শায়খ উসামা এমনই ছিলেন। যেমন শায়খ ওমর আব্দুর রহমান, শায়খ আহমাদ ইয়াসিন ও অন্যান্য উলামাগণ। তিনি,তাঁদের ইলম, শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগামিতার মর্যাদা রক্ষা করতেন। তাঁরা পার্লামেন্ট ও নির্বাচনের মাসআলাসমূহে নিজেদের ইজতিহাদের কারণে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তাতে তাঁদেরকে ওযরগ্রস্ত মনে করতেন। কিন্তু নিজে তাদের ফিকহী ও আকিদাগত মতামত এবং তাঁরা ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তার বিরোধিতা করতেন এবং আল্লাহ, তাঁর কিতাব, মুসলিমদের ইমাম ও সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করত: প্রকাশ্যে তাদের মতের বিপক্ষে বলতেন। যে সময় শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ সুদানে প্রস্থান করলেন, তখন তিনি সুদানের পদচ্যুত তাগুত ওমর আল-বশীর বা তার সরকারের সদস্য ও পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদের ব্যাপারে কুফরের ফাতওয়া দেননি, যেহেতু তাদের মাঝে শরীয়তের সাহায্য করার আগ্রহ অনুভব করেছিলেন। শায়খ রহিমাহুল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত এবং এই হীন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগ পর্যন্ত এই নীতির উপরই চলেছেন। তথা তাকফীরের ব্যাপারে সতর্ক থাকা, তাকফীরের লাভ-ক্ষতির বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিরোধীদেরকে ওযরগ্রস্ত মনে করা এবং মতপার্থক্যকে তার উপযুক্ত স্থানে তথা ক্ষমা ও মূল্যায়নের স্থানে রাখার উপরই চলেছেন। আর শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য আলেমদের মধ্যে যারা এ ধরণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে কুফর বলতেন, তাঁরা এ মাসআলাগুলোতে তখনই কঠোর কথাবার্তা বলেছেন, যখন দেখেছেন, মানুষের মাঝে ঈমান ও তাওহিদের মাসআলায় শেষ যুগের আলেমদের নীতি গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে গেছে। আলেমদের এমন নীতি যার মধ্যে সৃষ্টিজগতে আল্লাহর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য, তথা স্রষ্টার হককে সৃষ্টির হকের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং ইসলামের হককে মুসলিমদের নিজেদের হকের উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয় না। যখন দেখলেন যে, মানুষ দ্বীনী জরুরতকে নিজেদের জান-মালের জরুরতের উপর প্রধান্য দিচ্ছে না, যারা ইসলামের অন্তর্ভূক্ত না, তাদেরকে তার অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে ইসলামের সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে বড় শিরক করাকে সাধারণ ফিকহী ইজতিহাদী হারাম বলে অভিহিত করছে।

উপরন্তু মুসলিমদের মাঝে যারা বড় শিরকে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের কাউকেই তাকফীর করা যাবে না বলে বড়াবাড়ি করছে, যারা অসংখ্য আমলী ও ইতিকাদী ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হচ্ছে, তাদেরকে যোগ্য লোক হওয়ার অজুহাতে ব্যাপকভাবে ওযরগ্রস্ত মনে করছে, বিশেষ করে আমাদের যামানার মুসলিম দেশসমূহের শাসকশ্রেণী এবং তাদের সরকারের অঙ্গসমূহ, যেমন সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীকে, যাদের মনে সর্বদা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তা ছাড়া কোনো চিন্তাই থাকে না।

শায়খ উসামা ও অন্যান্য আহলে ইলমগণ, মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের মাঝে এ প্রকার শিরক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে, স্রষ্টার হক রক্ষার জন্য এবং উম্মতের প্রতি দরদী হয়ে এ ধরণের মাসআলাগুলোতে কঠোরতাকে ভালো মনে করেন। হুবহু যেমন কঠোরতা করেছিলেন শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ, বিশ শতকের জাহিলিয়্যাহ ও সমসাময়িক শিরকের ব্যাপারে, যেটা তাঁর যামানায় ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল।

একারণেই আমরা দেখতে পাই, ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ লিবিয়ার গাদ্দাফীকে, সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদকে এবং মিশরের আব্দুন নাসেরকে কাফের ফাতওয়া দিয়েছেন, যারা এ শিরকের সাথে জড়িত হয়েছিল এবং এই জাহিলিয়্যাকে সুদৃঢ় করেছিল।

মোটকথা, একজন সত্যানুসন্ধানীকে বুঝতে হবে যে, শায়খ উসামা ও ইসলামের অন্যান্য উলামাগণ এ মাসআলাগুলোতে কঠোরতা করেছিলেন এ ধরণের শিরকগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে, অধিকাংশ গতানুগতিক আলেমরা এ ব্যাপারে নীরব থাকার কারণে এবং তাদের পক্ষ থেকে অনেক অপরিবর্তনীয় অকাট্য মাসআলাগুলোকে সংশয়পূর্ণ করে ফেলার কারণে। বিশেষ করে গরম তেলে ঘি ঢেলে দিয়েছে আকিদার মধ্যে মুরজিআ ফেতনার প্রসার ও আধুনিক যুগের আলেমদের ধ্যান-ধারণা, যারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করাকে একেবারে নিষিদ্ধ মনে করে। এবং নব আবিস্কৃত এমন অনেক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাকফীরের হুকুম আরোপ করতে নিষেধ করে, যে ধরণের প্রতিবন্ধকতার নজির বা উপমা ফিকহের জগতে আদৌ পরিচিত নয়। যেমন মানবতা, দেশীয় নাগরিকত্ব। এমনকি তারা নাম ও বিশেষণের অধ্যায়টি বর্ণনা করাকেই খারাপ বলে। ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ নিরাপদ রেখে শুধুমাত্র কাজের উপর কুফর শব্দটি প্রয়োগ করেই ক্ষ্যান্ত থাকতে বলে।

এক্ষেত্রে মাসআলাগুলো প্রকাশ্য হওয়া বা অপ্রকাশ্য হওয়া, ব্যক্তির জানা থাকা বা জানা না থাকা এবং সে স্বেচ্ছায় করা বা ভুলে করার মাঝে কোনো পার্থক্যও করে না। যার ফলে আজ আমরা এ পর্যায়ে এসেছি যে, কতিপয় নিকৃষ্ট লোক কুরআনের কিছু শব্দকে নরম করার এবং কিছু আয়াতকে আপন স্থানে স্থবির করার প্রস্তাবও করে। আমি নিজে এরূপ একজনকে আল্লাহর বাণী قل يا أيها الكافرون (বল, হে কাফেরগণ!) পরিবর্তন করে يا أيها الآخرون (হে অন্যান্য লোকগণ!) বসানোর প্রস্তাব করতে শুনেছি। শায়খ উসামা বা তাঁর পূর্ববর্তী আহলে ইলমদের নীতি এরকম বাড়াবাড়ি নয়। কিংবা খারেজি ও জাহিরীয়াদের মত নয়। যেমনটা এই লেখকের বচনে ও ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। বরং তাঁর নীতি হলো আল্লাহর হকের সম্মান রক্ষা করা, সৃষ্টিজীবের হকের উপর তাঁর হককে প্রাধান্য দেওয়া এবং এমন গভীর ফিকহ, তথা দ্বীনি বুঝ, যা উক্ত লেখকের পক্ষে বুঝা ও অনুভব করাও কঠিন। আর এ সকল শিরকী কার্যক্রম ও যারা এর কোনোটাতে লিপ্ত হয়, তাদের হুকুমের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করা। যেটা কুরআনে কারীমেরই নীতি। অর্থাৎ যারা এ সকল কুফরী কথা ও কাজগুলোতে লিপ্ত হয়, তাদের নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ না করে সাধারণভাবে হুকুম বর্ণনা করা।

যেমন আল্লাহ তায়ালা কুফরী কথা উচ্চারণকারীর তাকফীরের মূলনীতি বর্ণনা করে বলেন -

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

"নিশ্চয়ই সে সকল লোক কাফের হয়ে গেছে, যারা বলেছে আল্লাহ হলেন মাসিহ ইবনে মারিয়াম" [সুরা আল-মায়েদা ৫;৭২]

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

"নিশ্চয়ই সে সকল লোক কাফের হয়ে গেছে, যারা বলেছে, আল্লাহ হলেন তিনজনের তৃতীয় জন।" [সুরা আল-মায়েদা ৫;৭৩]

এমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোনো কুফরী কাজের কর্তার তাকফীরের মূলনীতি বর্ণনা করে বলেন -

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান দিয়ে শাসন করে, ওই সকল লোক কাফের।" [সুরা আল-মায়েদা ৫;৪৪]

তাই এ সবগুলো হল তাকফীরে মুতলাক, তথা অনির্দিষ্ট তাকফীর, যাকে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত না করে, কোনো গুণ বা কথা বা কাজের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এমনটাই শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

যে জেনে শুনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে আইন প্রণয়নকারী প্রভু নির্বাচন করবে, সে কাফের।

তাহলে কী হল ব্যাপারটা? শাসকশ্রেণী ও তাগুতদেরকে তাকফীরের মাসআলায় শায়খ উসামা যে নীতির উপর চলেছেন, তা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ও বুদ্ধিমান লোকদের নিকট একটি প্রমাণ হল: আরব বসন্তের পরে ব্যাপকভাবে লোকজন তাঁর চলিত নীতির উপরই চলেছেন। বিশেষ করে বর্তমান উম্মতের অনেক বড় ও মর্যযাদাবন আলেমগণও।

আমরা দেখেছি, তাদের কেউ কেউ টিভি চ্যানেলে কিভাবে জনসম্মুখে পরিস্কারভাবে ওই সকল লোকদেরকেই কাফের আখ্যায়িত করছেন, যাদেরকে শায়খ উসামা দুই দশকেরও পূর্ব থেকে তাকফীর করে আসছেন। যেমন গাদ্দাফী, আসাদ, আলী সালেহ, শাইন আবিদীন, ইবনে যায়েদ, সৌদ পরিবারের তাগুতগোষ্ঠী ও তাদের মতো বর্তমান যামানার অন্যান্য তাগুতদেরকে।

এতদ্বসত্বেও শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ মুসলিম দাবিকারী এ সকল সরকারগুলোর সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে নির্দিষ্ট করে তাকফীরের হুকুম আরোপ করতেন না। যেমন সৌদি সেনাবাহিনী ও তাদের মতো সেনাবাহিনীগুলো, যাদের মাঝে ব্যাপকভাবে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতার ওযর রয়েছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট করে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ তাকফীর করতেন না বা এ আকিদাও রাখতেন না। যদিও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয হওয়ার কথা বলতেন। এ হিসাবে যে, তারা শরীয়তের কিছু কিছু বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। বিশেষ করে যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং মুসলিম দেশগুলোকে দখলের ক্ষেত্রে ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে তাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগীতার অবস্থা প্রকাশিত হয়ে গেছে। এ মতই পোষণ করেন আল-কায়েদার অধিকাংশ ফুকাহাগণ। তাঁদের মাঝে এর উপরই আমল ও ফাতওয়া জারি আছে। তাঁদের কারো কারো থেকে আমি এটা বারবার শুনেছিও। যেমন শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল লিবী, আতিয়্যাতুল্লাহ, খালিদ আলহুসাইনান ও অন্যান্য ফকীহগণ। আল্লাহ তাঁদের কবুল করুন! এমনটাই বলেন শায়খ ডক্টর আইমান আল-জাওয়াহিরী ও তাঁর সকল সাথীগণ। আর লেখকের দাবি- শায়খ আযযাম এ মাসআলাগুলোকে ঈমান ও কুফরেরে সাথে সম্পর্কিত মাসআলাই মনে করতেন না- যেমনটা তার নিম্নোক্ত বক্তব্যে উঠে এসেছে:

এটা তো দূরের কথা, বরং ইসলামী নেতৃবৃন্দের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হুকুমের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। যার সাথে প্রায় ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের মাসআলা সমূহের কোনো সম্পর্কই ছিল না। বরং প্রত্যেক দেশের পরিস্থিতি হিসাবে হালাল-হারামের মাঝেই উঠানামা করত তার মতগুলো।

অথচ তারই পরবর্তী কথা এবং এ বক্তব্যটির মাত্র কয়েক লাইন পরে লেখক যা বলেছে, তা তার একথাকে খণ্ডন করে দেয়। দেখুন, লেখক বলছে:

শায়খ আযযাম মানবরচিত আইনের হুকুমের ব্যাপারে দীর্ঘ গবেষণার পর যে সারাংশে পৌঁছেছেন, তা হল: যে শাসক আল্লাহর বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান প্রণয়ন করে (বাস্তবায়ন নয়), অর্থাৎ বিভিন্ন আইন তৈরী করে এবং এমন আইনী উদ্ধৃতির মাধ্যমে আদেশ-নিষেধ করে, যা কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতির বিরোধী, এটা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এমনিভাবে সেই আইন রচয়িতা, যে আইনী ধারায় তা সংস্থাপন করে। এরা হল আইন প্রণয়নকারী। এমনিভাবে প্রতিনিধি সভার এমন যে কেউ, যে যেকোনো একটি শরীয়ত বিরোধী আইনের সাথে একমত পোষণ করে।

তাহলে যখন শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর বিধান ব্যতীত ভিন্ন বিধান প্রণয়নকারী ও তার দ্বারা শাসনকারী এবং উক্ত মানবরচিত আইনকে আইনের পত্রে সংস্থাপনকারী এবং প্রতিনিধি সভার যে-ই শরীয়ত বিরোধী মানব রচিত আইনের কোনো একটি ধারার সাথেও একমত পোষণ করবে বা সে অনুযায়ী আমল করতে পছন্দ করবে, এমন প্রত্যেকের উপর তাকফীরের হুকুম আরোপ করেন,

তাহলে এর পরে লেখকের এই কথা কিভাবে ঠিক থাকে যে: শায়খ আযযাম পার্লামেন্ট নির্বাচন বা কুরআন বিরোধী আইন সভায় অংশগ্রনের মত রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাসআলাগুলোকে এমন মনে করেন যে, তার সাথে প্রায় ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের মাসআলার কোন সম্পর্কই নেই, বরং প্রত্যেক দেশের পরিস্থিতি হিসাবে হালাল-হারামের মাঝেই তার মতগুলো উঠানামা করত??? সঠিক কথা হল, শায়খ রহিমাহুল্লাহ কুফরী আইন প্রণয়নকারী ও আইন প্রতিস্থাপনকারী শাসকের উপর কুফরের হুকুম আরোপ করতেন। তবে বিচারক, ভোটার ও প্রতিনিধিদের ব্যাপারে শক্ত নিন্দাবাদ জানাতেন। তিনি বিদ্রুপাত্মকভাবে বলতেন: প্রতিনিধি সভা হল একেকটি পুতুল ও খেলার গুটি। তাদের শব্দগুলো বের হয় বিপদ থেকে, বিবেক থেকে নয়।

কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হওয়ার হুকুম আরোপ করতেন না, যেহেতু তারা একটি কুফরী আইনের প্রতিও সম্মত ছিল না এবং তারা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ সকল কুফরী বিধান ও আইনগুলোকে ঘৃণা করত। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি তাদের মাঝে আর যে মদ্যশালায় মদ বিক্রি করে তার মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না। তিনি অনেকবার ফতওয়া দিয়েছেন যে, তাদের বেতন ভাতা হারাম। তাদের কিছু খেতে ও তাদের হারাম মাল দ্বারা উপকৃত হতে নিষেধ করতেন।

পক্ষান্তরে, তাদের মধ্যে যারা এ সমস্ত আইনগুলোকে ভালোবাসে বা পার্লামেন্টে কোনো কুফরী আইনের সুস্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে না, তার ব্যাপারে চুপ থাকে বা তার সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করে, সে শায়খ আযযামের নিকট ইসলাম থেকে বহিস্কৃত, যেমনটা তিনি “আয-যাখায়িরুল ইযাম”এর অনেক স্থানে বলেছেন। সর্বোপরি, যে সারকথার উপর ইমাম আযযামের মত স্থির হয়েছে, তা হল: আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান বাদ দিয়ে আইন প্রণয়ন করা, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান বাদ দিয়ে শাসন করা, বিভিন্ন অডিট কমিটি, যেমন প্রতিনিধি কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া বা কার্য নির্বাহী কমিটি যেমন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করা- এগুলোর প্রত্যেকটির মাঝে পরস্পর পার্থক্য আছে। এ ব্যাপারে তার অনেক বিশ্লেষণ ও শর্তাদি আছে, যেগুলোর বিশদ আলোচনার স্থান এটা নয়। শায়খের সিদ্ধান্ত হল: নির্বাচন, পার্লামেন্ট ও প্রতিনিধি সভার বিষয়টি, এমনিভাবে শাসনকর্তৃত্ব ও তার সুবিস্তৃত গভীর শাখাগত মাসআলাসমূহের বিষয়টি অনেক অনেক দীর্ঘ বিষয়। কিন্তু তার সম্পর্কে যে বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত, তা হল: তিনি এমন প্রত্যেক কার্য নির্বাহী, বিচারক ও প্রতিনিধিকে অকাট্যভাবে কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতওয়া দিতেন, যারা কোনো কুফরী আইনের সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করত বা তাকে ভালোবাসত। তিনি সেই ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককেও ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বলে মনে করতেন, যে আল্লাহর হুকুমকে পরিবর্তন করেছে, যদিও একটি মামলায় হোক না কেনো। কেউ আরো অধিক জানতে চাইলে ইমাম আযযামের সূরা তাওবার তাফসীর দেখতে পারেন। সেখানে আরো অধিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে।

পরিশেষে: এই হল ঈমান ও তাকফীরের ক্ষেত্রে উভয় ইমামের মত ও নীতি। তাই লেখক যখন তাকফীরে মুআইয়ান, তথা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে তাকফীর করা আর তাকফীরে মুতলাক, তথা কোনো গুণ বা কথা বা কাজের ভিত্তিতে অনির্দিষ্টভাবে তাকফীর করার মাঝে পার্থক্যই বুঝে নি, তাই তার জন্য শায়খ উসামার উপর এ অপবাদ আরোপ করা সমীচীন নয় যে, তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উপর তাকফীরের হুকুম আরোপ করেছেন বা লেখক তার বক্তব্যের মাঝে পেয়েছেন:

বিরোধী দলসমূহের সমষ্টির উপর ঢালাওভাবে তাকফীরের হুকুম আরোপ করার প্রবণতা, যাদের মাঝে আছে সে সকল ইসলামিক লোকগণও, যারা জাহিলী শাসনব্যবস্থার পার্লামেন্টে বা মন্ত্রণালয়ে বা তার কোনো মৈত্রী চুক্তিতে যুক্ত হয়।

লেখক যেন নিজের কাছে ও পাঠকদের কাছে স্পষ্টবাদী হয় এবং সে সকল ইসলামী জামাতের নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করে, যাদেরকে শায়খ উসামা নির্দিষ্ট করে তাকফীর করেছেন এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম আরোপ করেছেন। এবং যাদের ব্যাপারে এই লেখক বলেছে:

বিরোধী দলসমূহের সমষ্টির উপর, যাদের মাঝে আছে সে সকল ইসলামিক লোকগণও, যারা জাহিলী শাসনব্যবস্থার পার্লামেন্টে বা মন্ত্রণালয়ে বা তার কোন মৈত্রী চুক্তিতে যুক্ত হয়।

পঞ্চম আপত্তি: ইবনে লাদেনের চিন্তা-চেতনা ও মুসলিম উম্মাহর অন্তরে তার সামাজিক অবস্থান:

এই লেখক উক্ত আলোচনা সমাপ্ত করেছে তার রীতিমত ইবনে লাদেনের সমালোচনা ও কটাক্ষ করার মাধ্যমে। লেখক বলেছে:

আমরা ইবনে আযযাম ও ইবনে লাদেনের আওতাধীন এলাকার মাঝেই তাকফীরের হুকুম আরোপ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান দেখতে পাই। আর তা প্রত্যেক পক্ষের ফিকহী ধ্যান-ধারণার মাঝে বিশাল পার্থক্য থাকার কারণে, যা তার বিধান ও ফাতওয়ার মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ইবনে আযযামের শাস্ত্রীয় মন-মানসিকতা বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ পদ্ধতি ও বিভিন্ন রূপ ইজতিহাদ দেখে অভ্যস্ত। তিনি জীবনের বিভিন্ন পার্শ্বে, -যার মধ্যে আছে রাজনীতিও- প্রতিটি বিষয়কে শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখেন। কাজের অনুপ্রেরক, পূর্বাপর অবস্থা, শক্তি ও পরিণতির দিকে লক্ষ্য করেন। একারণেই তিনি ঢালাওভাবে হুকুম আরোপ করা থেকে বেঁচে থাকেন। নির্দিষ্টকরণ ও বিশ্লেষণের আশ্রয় নেন। অপরিবর্তনীয় বিষয়কে পরিবর্তনীয় বিষয়ের সাথে এবং আকিদাকে ফিকহের সাথে মিলিয়ে ফেলেন না। ইসলামের কর্মী ও সাধারণ মুসলিমদের নিকট তাওহিদ ও আকিদার বিষয়গুলোকে সন্দেহপূর্ণ করা থেকে বেঁচে থাকেন।

পক্ষান্তরে, ইবনে লাদেনের ধ্যান-ধারণা এক্ষেত্রে, যেমনটা আমরা দেখেছি ইবনে লাদেন প্রথমে একটা চিন্তাকে আপন করে নিয়ে সেটাকেই একক মাপকাঠি বানায়। অতঃপর,অন্য সকল মতামতগুলোকে তার আলোকে মাপে। মতভিন্নতার মূল উৎস ও কারণ অনুসন্ধান করে না। ইসলামের কর্মী ও সাধারণ মুসলিমদের বিশাল জামাতের উপর চূড়ান্ত হুকুম আরোপ করতে ভয় করে না। এটা হল ফিকহীভাবে তার পরিতৃপ্ততা এবং ওহাবী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ধারার উপর নির্ভরশীলতার কারণে। এবং সেই ধ্যান-ধারণার কারণে, যা তাকে উম্মাহর অধিকাংশ সুন্নী শিক্ষালয় ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আকিদার রং মাখানো রক্তাক্ত লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। গত তিন দশকে জিহাদ, আন্দোলন ও ইসলামী কাজের ময়দানগুলোতে উভয় ধ্যান-ধারণার প্রতিফলনগুলোর মাঝে সামান্য তুলনা করলেই আজ আমাদের জন্য চিন্তাকে কাজে লাগানোর ফরজ দায়িত্ব পুনর্জীবিত করার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে, যা আজ অনুপস্থিত।

মুনতাদাল উলামা থেকে প্রকাশিত সংস্করণে লেখকের প্রবন্ধটিতে এসেছে:

পক্ষান্তরে ইবনে লাদেনের ধ্যান-ধারণায় প্রবল হয়ে গেছে সৌদি আরবে প্রচলিত জাহিরী বা বাহ্যিক চিন্তা-ভাবনা, যারা নিজেদেরকে সকল হকের একমাত্র সমন্বয়ক এবং তাওহিদের একমাত্র হেফাজতকারী হিসাবে সিদ্ধান্ত দানের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করে। এ চিন্তা-ভাবনাই শায়খ আযযাম কর্তৃক মুসলিম ঘরের ভেতরকার ভ্রাতৃসুলভ মতবিরোধগুলো বন্ধ করার কাজকে ব্যাখ্যা করে (যেটা তাদের কারো কারো সবচেয়ে মারাত্মক কথা): “ই’দাদ ও জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত” বলে আর ইবনে লাদেন কর্তৃক নিজের অস্ত্রের সঙ্গী ও ইসলামের কর্মীদের সঙ্গে মতবিরোধকে ব্যাখ্যা করে: “তাওহিদ নিয়ে দ্বন্দ্ব” বলে।

পূর্বোক্ত আলোচনায় শায়খ উসামার ধ্যান-ধারণা নিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণ ও ইচ্ছাকৃত সমালোচনা করা হয়েছে। এটা এমন অপবাদ ও তুহমত, যার জন্য উক্ত লেখককে দ্বীন-দুনিয়ার বিচারের দিন সঠিক জবাব দিতে হবে। অথচ শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ, তাঁর যোদ্ধা সাথী ও উম্মতের সকল শ্রেণী থেকে আগত মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে থেকেছেন। যদিও আকিদা ও ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল। যেমন: আফগানীদের সঙ্গে মাযহাবী ফিকহ ও শাখাগত আকিদার অনেক বিষয়ে শায়খের মতবিরোধ ছিল। আফগানের যে নেতৃবৃন্দ ও লিডারদের সাথে মিলে তিনি জিহাদ করেছেন, তাদের অনেক মাসআলায় তিনি তাঁদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। যেমন তাবিজ, ওসিলা গ্রহণ, পুণ্যবান ও তাদের নিদর্শনের

মাধ্যমে বরকত গ্রহণের মাসআলাসমূহ। এমনিভাবে ঈমান, আল্লাহর গুণাবলী, হিকমত ও তালীলের মাসআলাসমূহ এবং আল্লাহর অবস্থান, ইস্তিওয়া ও এ জাতীয় আকিদাগত আরো যত প্রসিদ্ধ মাসআলাগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কেও। এমনিভাবে আফগানীরা তাঁর থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন ফরজ নামাযের পর ইজতিমায়ীভাবে দু'আর মাসআলায় এবং নামাযের মধ্যে রফউল ইয়াদাই ও আমীন জোরে বলার মাসআলায়। কিন্তু তিনি নিজ সাথীদের মাঝে এবং নিজ ঘরে পরিবারের সাথে হানাফী নেতৃবৃন্দের অনুরূপই নামায আদায় করতেন।

অধিকাংশ আফগানীরা নকশাবন্দী সুফীবাদী ধারা ও মাতুরিদী আকিদার উপর ছিল। তিনি এগুলো সত্ত্বেও তাদেরকে ভালোবাসতেন, তাদের কল্যাণ কামনা করতেন এবং তাদের সাথে চূড়ান্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ আফগানীরা তাকে ভালোবাসত ও তাঁর সাহায্য করত। সুদানেও ইবনে লাদেন রহিমাহুল্লাহ যাদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন এবং যারা তাঁর থেকে ভিন্নমত পোষণ করত, তাদের সঙ্গে এভাবেই থেকেছেন। তিনি তাদের ইসলামী ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসত এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সাহায্য করত।

এমনিভাবে সমগ্র বিশ্ব দেখেছে যে, যে সময় ইবনে লাদেন রহিমাহুল্লাহ শাহাদাত বরণ করলেন, তখন বিভিন্ন ইসলামী দেশের মুসলিম জনসাধারণ কিভাবে বের হয়ে পড়েছিল তাঁর জন্য দুআ করতে এবং তাঁর প্রতি ও তাঁর মতবাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে। এদের মাঝে সর্বাগ্রে ছিল সুদান, পাকিস্তান, মিশর, ফিলিস্তীন, তিউনিশিয়া ও আরো অনেক মুসলিম দেশের ইসলামের কর্মী নেতৃবৃন্দ। এমনকি ইবনে লাদেনের ধারার বিরোধী ইসলামিস্টগণও সুস্পষ্টভাবে তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর জন্য রহমতের দু'আ করেছেন। অথচ এটা তাদের সংগঠনের ভবিষ্যতের জন্য এবং তাদের ব্যক্তিগত অবস্থানের জন্য আশঙ্কাজনক ছিল।

তাই, এ প্রবন্ধের লেখক উল্লেখিত অন্যায় ও মিথ্যা অপবাদের পর কিভাবে আমাদেরকে এ কথার প্রতি আশ্বস্ত করাবে যে, ইবনে লাদেনের মন-মানসিকতায় বাহ্যিক চিন্তা-ভাবনা প্রবল হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি হকের একমাত্র সমন্বয়ক ও তাওহিদের একমাত্র রক্ষক হিসাবে নিজের একক মতামত ছাড়া ভিন্ন কোনো মত গ্রহণ করেন না? বরং এর বিপরীতে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ সামগ্রিক ও সার্বজনীন ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন। তিনি কয়েকটি নিরস্ত্র ইসলামী দল ও সংগঠনের অর্থায়নে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজ হাতে "ইসলামের কাজ: ঐক্যের দাবি ও অনৈক্যের আহ্বানকারীদের মাঝে" নামক কিতাবের ভূমিকা লিখেন। লেখক চাইলেই সেটি দেখতে পারে।

তবে ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্গত কিছু লোক ইসলামের কাজ করার এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার দাবি করে। কিন্তু এই দাবি সত্ত্বেও বর্তমানে আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়ামেন, সোমালিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে ক্রুসেড হামলার সমর্থন করে। এবং সে সকল ক্রুসেডার সৈনিকদের সহযোগিতা করে, যারা প্রকাশ্যে আমাদের রবের কালাম ও আমাদের কুরআনে কারীমের উপর প্রশ্রাব করার ঘোষণা দেয়, যেমনটা বাগরাম, আবু গারিব ও অন্যান্য কারাগারে সংগঠিত হয়েছে। সে ক্রুসেডারদের দালালদের জন্য মুজাহিদীনকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ফাতওয়া দেয়, তাহলে এ ধরণের লোকদের কথা ও ইজতিহাদের সম্মান করে একমাত্র এমন লোকই, যার মানসিক সমস্যা আছে এবং যার শরীরে ঈমানী রক্ত নেই। এ ধরণের লোকদের সঙ্গে নিজের মতবিরোধকে শায়খ রহিমাহুল্লাহ শুধু তাওহিদ নিয়ে দ্বন্দ্বই বলেই ক্ষ্যান্ত হননি, বরং তিনি প্রকাশ্যে এদের নীতির নিন্দাবাদ করেছেন। এদের বক্রতা ও বিকৃতির ঘোষণা দিয়েছেন এবং এদের থেকে পরিপূর্ণ সতর্ক থাকতেন।

এ নীতির উপরই, অর্থাৎ মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা, সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা, অন্যায় কাজ হতে বাঁধা প্রদান করা এবং অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট করে তোলার উপরই শায়খ রহিমাহুল্লাহ, ইমাম আযযামের সঙ্গে তাঁর জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কাটান এবং এর উপরই আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

আর এই লেখক ইমাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের নীতির উপর আক্রমণ করে বলে:

এর মূল উৎস হলো, এক কেন্দ্রিক ওহাবী ফিকহী মন-মানসিকতার প্রভাব, যারা সাদৃশ্যপূর্ণ বাহিক্য অবস্থা ও দ্ব্যার্থবোধক কারণের ভিত্তিতে হুকুম আরোপ করে দেয়। ঘটনার অনুপ্রেরক, পূর্বাপর অবস্থা ও কাজের সম্পর্কের দিকের প্রতি লক্ষ্য করে না।

তার এ দাবির খণ্ডনের জন্য পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের ইসলামের মহান ইমামগণ, ওহাবী ফিকহী ধ্যান-ধারণার প্রশংসা করে ও তাঁকে একটি সংস্কারমূলক দাওয়াত গণ্য করে যা লিখেছেন তা-ই যথেষ্ট।

আল্লাহ এর মাধ্যমে দ্বীনকে নতুন জীবন দান করুন, তার গ্রহণযোগ্যতা, ভালোবাসা ও বিস্তৃতি সমস্ত দেশে ও সমস্ত মুসলিমদের অন্তরে ঢেলে দিন। যে সকল আলেমগণ এ দাওয়াতের স্তুতি গেয়েছেন, তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার বিরুদ্ধাবাদীদের জবাব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অনেক মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ। যেমন: আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে নাসির আলহাযিমী আলইয়ামানী, আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বশীর আস-সাহসুওয়ানী আলহিন্দী, আল্লামা মাহমুদ শুকরী আল আলুসী আল ইরাকী এবং এছাড়াও আরো অনেকে।

কারাবন্দী আলেম শায়খ আব্দুল আজিজ আলে আব্দুল লতীফ (আল্লাহ তাকে অটল রাখুন এবং সৌদ পরিবারের তাগুতদের কারাগার থেকে মুক্ত করুন), পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলিমদের ইমামগণ ওহাবী ফিকহী ধ্যান-ধারণার প্রশংসা করে ও তার পক্ষে জবাব দিয়ে যা কিছু লিখেছেন ও সংকলন করেছেন তার সমষ্টির সারসংক্ষেপ লিখেছেন তাঁর অন্যন্য কিতাব "শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের দাওয়াতের বিরোধীদের দাবিসসূহ" এর মধ্যে। কোনো সত্যানুসন্ধানী চাইলে সেটা দেখতে পারেন। যাতে এই লেখকের ভাষাগুলো কতটা হিংসা, বিদ্বেষ ও এই সংস্কারমূলক ও দাওয়াতী ফিকহী ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে অজ্ঞতা বহন করে তা বুঝতে পারেন।

তবে আন্দোলনগত ভুল-ত্রুটি থাকা, যেমন তাঁর কিছু অনুসারীদের বাড়াবাড়ি এবং তার অযোগ্য উত্তরসূরীগণ কর্তৃক মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী রহিমাহুল্লাহ এর পথ থেকে বের হয়ে মুরতাদ মুহাম্মদ ইবনে সালমানের ধর্মের দিকে ফিরে যাওয়া, এগুলো কখনো এই সংস্কারমূলক দাওয়াতকে মাপার সঠিক মাপকাঠি হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

এখানেই দ্বিতীয় আসরের কলমের লাগাম টেনে ধরলাম। আল্লাহ চাইলে তৃতীয় আসরে ইমাম আযযামের চিন্তায় বৈশ্বিক জিহাদ নিয়ে কথা বলব ইনশা আল্লাহ। যেটাকে উক্ত লেখক জিহাদুল মুনাসারাহ (সহযোগীতামূলক জিহাদ) ও জিহাদুল মুহাজারা (হিজরতের জিহাদ) বলে নামকরণ করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন ইসলামী দলসমূহের সাথে উভয় ইমামের আচরণবিধি নিয়েও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই একমাত্র সাহায্য প্রার্থনার স্থল। যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোথাও সাহায্য প্রার্থনা করে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

চলবে ইনশা আল্লাহ ...

মুসলিম বিশ্বের খবরাখবর

১. কারা-নির্যাতনের শিকার মজলুম আলেম আল্লামা সুলাইমান আল-উলওয়ান (ফাক্কাল্লাহ আসরাহ)

সত্যপন্থি আলেমদের বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী রেখে সৌদি সরকার ইহুদী-খ্রিস্টানদের ইসলাম-বিধ্বংসী পরিকল্পনাগুলো একের পর এক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আর মুসলিম জাতিকে বিদগ্ধ আলেমগণের জ্ঞান ও নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করছে। তাদের নীল-নকশা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, অত্যাচারী সৌদি সরকারের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার সর্বশেষ আলেম হলেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খ আল্লামা সুলাইমান বিন নাছির আল-উলওয়ান (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু)। আল্লাহ তাঁকে তাগুতের কারাগার থেকে মুক্তি দান করুন। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সত্যের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফিক দান করুক। আমীন।

মাত্র ছয় মাস আগে, কারা-জীবনের দীর্ঘ পনেরো বছর কাটিয়ে বের হওয়ার আগেই, শায়েখকে পুনরায় (১৫-১১-১৪৪০ হি.) সোমবার রিয়াদের ফৌজদারি আদালত বিনা কারণে আরো ৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়। দোয়া করি, আল্লাহ যেন জালিমের জুলুম থেকে শায়খের মুক্তি-লাভকে ত্বরান্বিত করেন। উম্মাহকে তার ইলম ও খিদমত থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন।

এই দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজেকে এবং পুরো মুসলিম উম্মাহকে বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের মুসলিম ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের কারাবন্দীদেরকে মুক্ত কর"। আর উম্মাহর কর্তব্য হলো— কারাগারে বন্দীদের স্বস্তির ব্যবস্থা করা, কেননা এটা তাদের প্রাপ্য অধিকার। আলে সউদের কারাগার থেকে শরীয়াহসম্মত যেকোনো উপায়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করা উম্মাহর উপর ফরজ।

২. মজলুম জনপদ পূর্ব-তুর্কিস্তান ও চীন-সৌদি মৈত্রীচুক্তি

ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে নামমাত্র কাজ করার আড়ালে, মুসলিমদের জাগরণ ও ইসলামকে নিশ্চিহ্নকারী তথাকথিত আরব ও মুসলিম শাসকগণ, পূর্ব-তুর্কিস্তানে মুসলিমদের সমস্যার নিরসনে কোনো ভ্রূক্ষেপই করছে না। তুর্কিস্তান ছাড়াও অন্যান্য দেশে মুসলিমদের সমস্যায়, তারা দৃশ্যত ইসলাম ও মানবতাকে মুক্ত করতে ছুটে যাচ্ছে দেখালেও, বস্তুত তারা যাচ্ছে কেবল তাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুনাফা লাভ করতে। এর চেয়ে বেশি কখনো নয়। তাইতো তারা যেখানে স্বার্থ দেখে সেখানে ছুটে যায়, অন্যথা হাত-পা গুটিয়ে চুপসে বসে থাকে।

গাদ্দারের বংশধর বিন সালমান-ই শুধু তুর্কিস্তানিদের বিক্রি করে দিয়েছে এমন না। সে তো কেবল সেক্যুলার তুর্কি-প্রেসিডেন্ট এরদোগানের পথ অনুসরণ করেছে। বিন সালমান একা নয়, তার সাথে যোগ দিয়েছে কুয়েত, আমিরাত, বাহরাইনসহ আরো অনেক তাগুত শাসকবর্গ। এই ধারার পঁয়ত্রিশটি তাগুত শাসক মিলে, পূর্ব-তুর্কিস্তানে 'উগ্রবাদ নির্মূলকরণ' ও 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধকরণের' মিথ্যা অজুহাতে, আমাদের মজলুম উইঘুর মুসলিম ভাইদের উপর চালানো বর্বর চীনের অকথ্য নির্যাতন আর পৈশাচিক জুলুমকে সমর্থন জানিয়ে জাতিসংঘে চিঠি প্রেরণ করেছে। ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছেই আমাদের সব মিনতি আর অভিযোগ!

হায়! এই উম্মাহ আর কবে বুঝবে, এই মুসলিম নামধারী তাগুত শাসকবর্গ যে তাদের-ই শত্রু? কবে তারা এই নামধারী শাসকদের উৎখাত করতে সচেষ্ট হবে? তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে? নিজের জান, মাল ও জবান দ্বারা পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবে? (আল্লাহ না করুক) যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে তো পূর্ব তুর্কিস্তান, বার্মা, ফিলিপাইন ও গোটা আরব-ভূখণ্ড "আরেক আন্দালুসে" পরিণত হবে।

তখন এই উম্মাহ তামাশা ও ব্যর্থতার গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার কোনো পথই খুঁজে পাবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফায়সালা ঘোষণা না করবেন। তিনিই সমস্ত বিচারকদের বিচারক; সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।

৩. 'তোমরা ইয়াহুদীদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো'- ফিলিস্তিনী নেতা হাম্মাদ ফাতহী

ফিলিস্তিনী নেতা হাম্মাদ ফাতহী এক জনসভায় বলেছিলেন— মধ্যস্থতাকারীরা শুনে রাখো, ইয়াহুদীরা শুনে রাখো, অবশ্যই আমার মৃত্যু হবে। তখন আমি হবো সবার কাছে প্রিয়। নিশ্চয় আমি মৃত্যুবরণ করব, তবে জালেম পাপাচারী ইয়াহুদীদের ঘাড়ে আঘাত করে তবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব।

তিনি ইসরাইলকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'ওহে দখলদার ইসরাইল! ভালো করে শুনে রাখো, তোমরা যদি 'স্ট্রিপে'র অবরোধ তুলে না নেও, তাহলে আমরা আমাদের সবার মধ্যে বিস্ফোরকভর্তি বেল্ট বিতরণ করে সবাই একযোগে আত্মঘাতী হয়ে উঠব। তোমাদের বেষ্টনী প্রাচীর অতিক্রম করে তোমাদের মাঝখানে গিয়ে শহিদী হামলা চালাব'। এরপর তিনি সবাইকে আহ্বান করে বলেন, 'তোমরা ইয়াহুদীদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো। ওদের ধরে ধরে জবাই করো'।

এটা পরাভূত ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ শহর গাঁজার আহত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। যেই ফিলিস্তিন বহু বছর যাবত দখলদার ইয়াহুদীদের কাছে পরাভূত হয়ে আছে - শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বের শাসকদের ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা ও মুসলিমদের পারস্পরিক সাহায্য করাকে পরিত্যাগ করার কারণে।

কিন্তু আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছেন, যারা এখনো মুসলিমদের সাহায্য পরিত্যাগ করেননি। নিশ্চয় এই কথাগুলো খুবই জোরালো এবং মীমাংসার পথ প্রদর্শনকারী। শক্তি, দৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষোভ থেকেই এর সৃষ্টি হয়েছে। যা ইয়াহুদীদের সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ে তাদের প্রতি আমাদের অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। নিশ্চয় এই দীর্ঘশ্বাস নতুন করে আরো জোরালো ভাবে নিশ্চিত করে যে ফিলিস্তিনীদের এই স্বাধীনতার আন্দোলন চিরকাল পুরো মুসলিম উম্মাহর গলায় ঝুলানো এক আমানত। দোয়া করি, আল্লাহ আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইদের কুরবানী করার শক্তি বাড়িয়ে দিন। সত্য ও জিহাদের পথে অবিচল থাকার সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে আরো বাড়িয়ে দিন। আমীন।

হে ফিলিস্তিনী ভাইয়েরা!

তোমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহর শপথকে নিজেদের বুকে ধারণ করে নিয়েছে। তারা এই শপথ পূরণ করতে আল্লাহর কাছে সর্বদা সাহায্য প্রার্থনা করে।

৪. সোমালিয়ায় বিধ্বংসী শহীদী অপারেশন

কিছুদিন পূর্বে ইস্তিহাদি হামলার ক্ষুদ্র একটি ইউনিট, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীনের পাঁচ সিংহ, সোমালিয়ার নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টার ওই অভিযানে সোমালিয়ার ৪০ জন সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিহত এবং ৬০ এর অধিক গুরুতর আহত হয়। বিপরীতে শাহাদাত লাভে ধন্য হন উক্ত পাঁচজন মুজাহিদ (ইনশাআল্লাহ)। সোমালিয়ার উত্তর প্রদেশের "আসমায়ো" শহরে, আমেরিকান সামরিক ঘাটির পাশে অবস্থিত "আসআসী" নামক একটি সুরক্ষিত হোটেলে হামলাটি চালানো হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, শহরের বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা কেন্দ্রে ধারাবাহিক অপারেশনের পরেই হামলাটি করা হয়েছিল এবং সোমালিয়ার ড্রোন নিয়ন্ত্রণকারী আমেরিকান ফোর্সের উদ্দেশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত "ডোনাল্ড ইয়ামামোটো"র গোপন সফরের পর পরই এই অপারেশনটি পরিচালনা করা হয়।

আমাদের দৃষ্টির শীতলতা, সিদ্দিকী বংশধর,
ইমাম ও মুজাহিদ শানকিতী রহিমাহুল্লাহর
দুঃস্প্রাপ্য কবিতাসমগ্রহ হতে একটি

অনন্য কবিতা

'তাই তুমি জিহাদের ব্যাপারে
কোনো ত্রুটি করো না'

জিহাদের আয়াতসমূহ ও তা যে সফলতার দিকে আহ্বান করে তার শ্রবণকারী কিভাবে স্থির থাকতে পারে?

إِنْ يَثْقَفُوْكُمْ ও وَلَنْ تَرْضي, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ এর তিলাওয়াতকারীরা এগুলো থেকে কোথায় সরে গেছে?

ومن يهاجر ও قل إن كان آباءكم এর পাঠকারীদের বাসস্থান কিভাবে কুফরের দেশে হতে পারে?

যে তাগুতের প্রতি আশার দৃষ্টি দিয়ে থাকে, আর কুরআনের উপদেশের দ্বারাও বিরত না হয়, সে কিসের দ্বারা ভীত হবে?

তোমাদের মধ্যে কেউ কি আল্লাহর দ্বীনকে শক্তিশালী করার জন্য আছো? হায়! দ্বীনের দেয়ালগুলোতে ভিত্তিসহ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে!

তোমরা কি দুনিয়ার বিনিময়ে তোমাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছ, আর শয়তানের রজ্জু আকড়ে ধরেছ, যার প্রবঞ্চনাগুলো অতি দুর্বল?

হায়, তোমরা কি দ্বীনের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ, অথচ দ্বীনের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের ভয়াবহতা অস্পষ্ট নয়?

তাদের বুলি ও আদর্শই কি তোমাদের মধ্যে বিস্তার করেছে, অথচ তোমাদের প্রতি তাদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার এখনো বিদ্যমান?

যে দ্বীনের সাহায্যে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসে না সে-ই গুনাহগার, তাহলে যে প্রকাশ্যে নাসারাদের সাহায্য করে, সে কী হতে পারে?

তাই যে কুফরের দেশ থেকে হিজরত করার সামর্থ্য রাখে, তবু সে পিছিয়ে থাকে, তার এ পিছিয়ে থাকাই তার ধ্বংস।

পরিবার ও সম্পদ কোনো ওযর নয়, দ্বীনের বিবেচনায় তার গ্রহণযোগ্যতা একেবারেই শূন্যে।

তাই সে কতই না বিস্ময়কর!, যে সত্যধর্মের দাবি করে, অথচ তার ঘর মুশরিকদের ঘরসমূহের মাঝে!

তাদের বিধি-বিধান তার উপর কার্যকর হয়, আর তার বিষয় তাদের প্রবৃত্তির বিচারের উপর নির্ভরশীল হয়।

তাই সে যদি তার ইসলামের দাবিতে সত্যবাদি হত, তাহলে অবশ্যই ইসলামী দেশের যেকোনো স্থানে বসবাস করত।

যারা চাকুরীর জন্য তাদের নিকট দৌঁড়ে যায়, তাদের কী অবস্থা! কোনো ওযর ছাড়া তাদের হাতে নিজের লাগাম তুলে দেয়।

দ্বীনি হিজরতের ব্যাপারে নিজেদের দুর্বল দাবি করে, কিন্তু হিজরত যদি দুনিয়ার জন্য হয় তখন তাদের সামর্থ্য প্রকাশ হয়ে যায়।

সে পরকালীন দারিদ্র্যকে হালকা করে দেখে। শুধু প্রবঞ্চনার জগতে অভাব কম থাকলেই হয়!

তাই তুমি জিহাদের ব্যাপারে কোনো ক্রটি করো না। আর যার ওযর সুস্পষ্ট, সে যেন তাদের থেকে নিজ বাসস্থান দূরে সরিয়ে নেয়।

সামর্থ্যবানের জন্য জিহাদ পরিত্যাগ করার কী ওযর থাকতে পারে? যদি সমস্ত মানুষ তাকে ছেড়ে দেয়, তবে আল্লাহ তার সাথে আছেন।

তাই যে দ্বীনকে মুছে দিয়েছে, তার থেকে দ্বীনি প্রতিশোধ নিতে ভুলে যেও না। কারণ তুমি যা কিছুর প্রতিশোধ কামনা করো, তার মধ্যে দ্বীনই সবচেয়ে উত্তম।

একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই তা টিকে থাকে। আর তাতে সীমালঙ্ঘনকারীর ক্রোধ ও তার ধ্বংস থাকে।

فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ

অতএব, যে তাগূত কে অমান্য করবে এবংআল্লাহর প্রতি ঈমানআনবে
অবশ্যই সে দৃঢ়তম রশি আঁকড়ে ধরবে, যা (কখনো) ছিঁড়বার নয়।

(সুরা বাকারাঃ ২৫৬)

AL HIKMAH MEDIA